



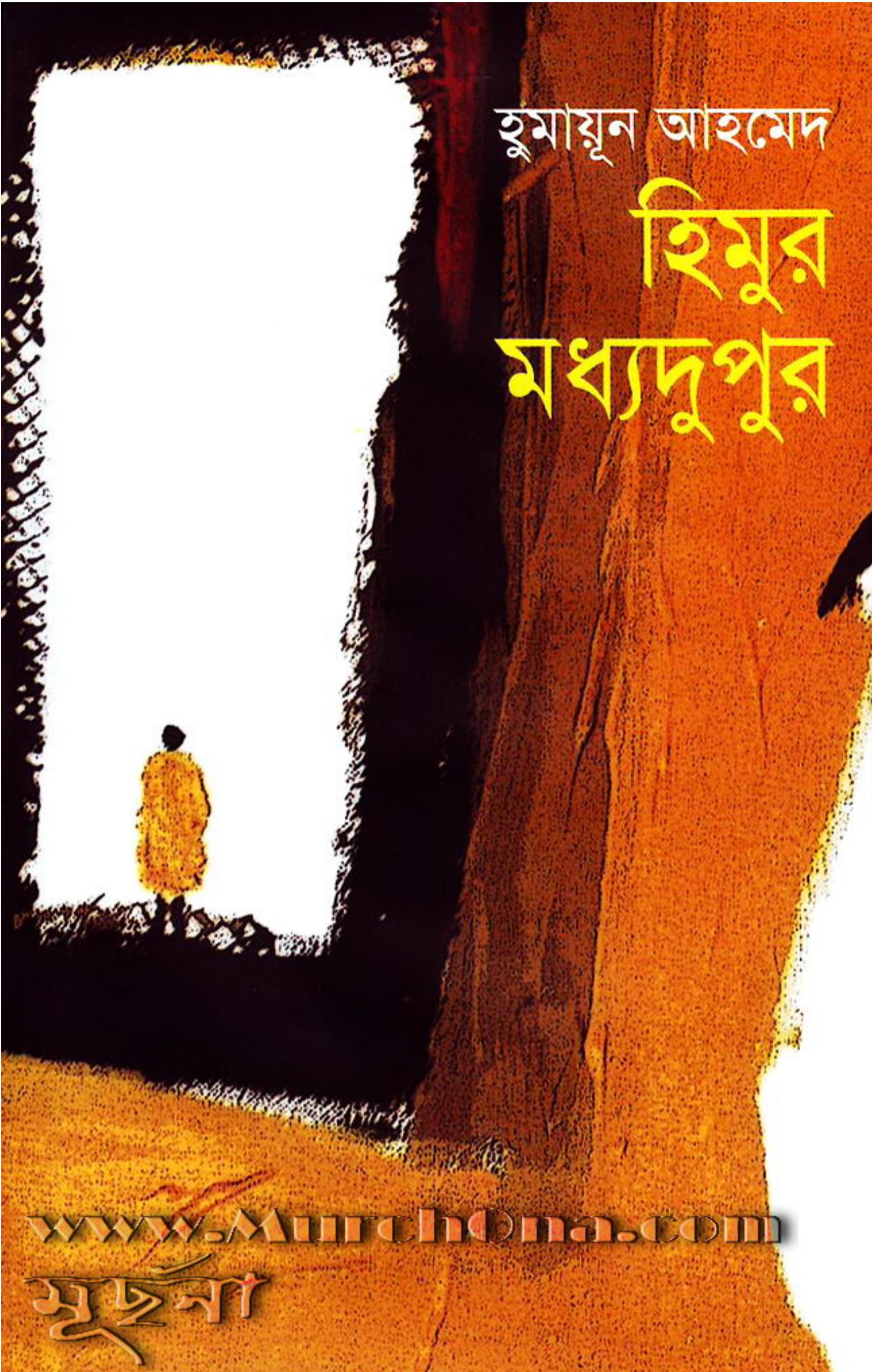
Himur Madhyadupur by Humayun Ahmed

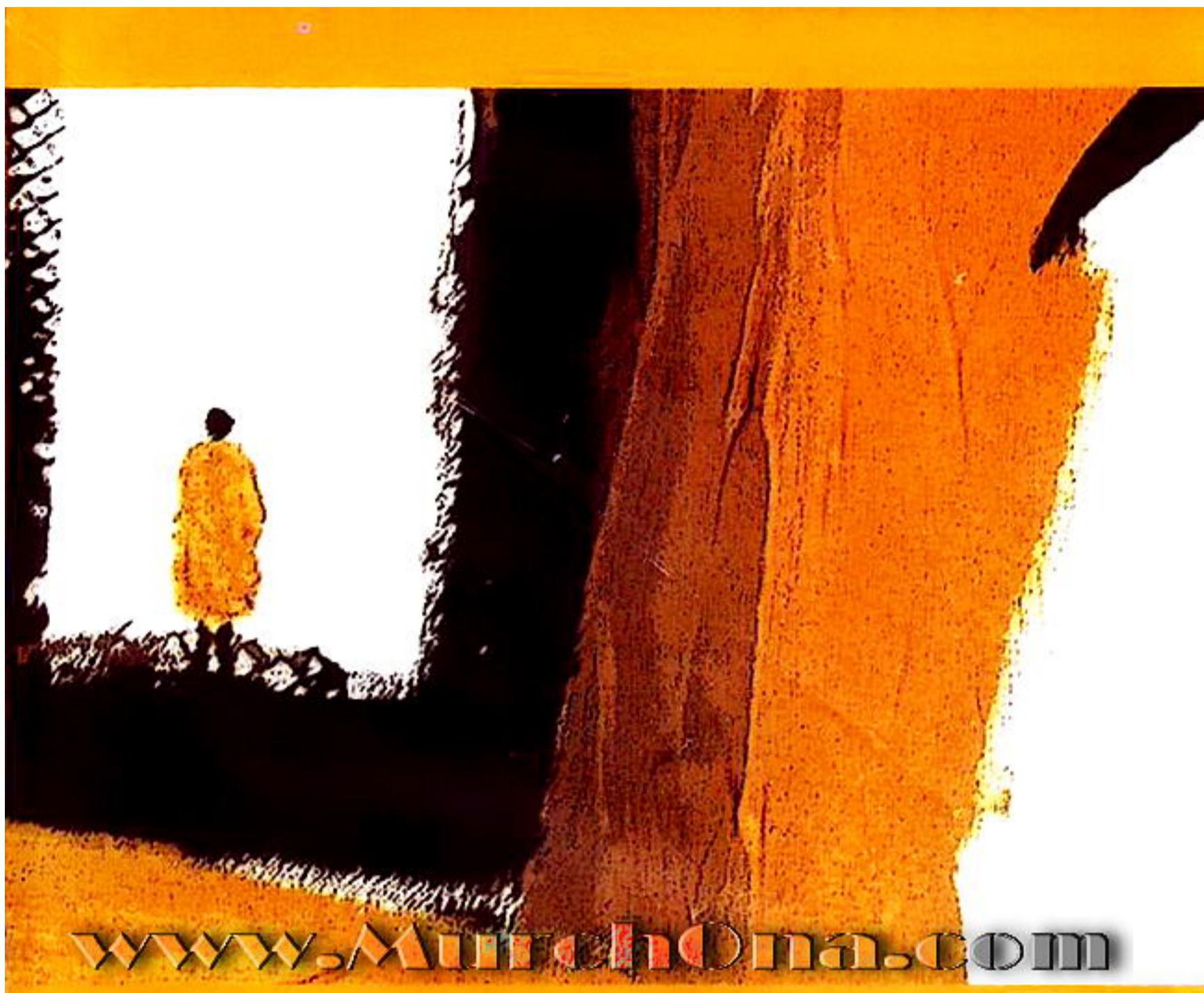


For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com

হুমায়ুন আহমেদ

তিমুর
মধ্যসুপুর





www.Muktobanoma.com

মধ্যদুপুর বড়ই আশ্চর্য সময় । তখন ‘‘ভূতে
মারে টিল’’ । এবং অঙ্গুত কোনো কারণে কিছু
সময়ের জন্য আকাশটা আয়না হয়ে যায় ।
হিমু হাঁটতে বের হয়েছে মধ্যদুপুরে । তার হাতে
ছোট একটা দুপুরমনি গাছের চাড়া । সেখানে
চার পাঁচটা ফুল । এখনো ফুটেনি । মধ্যদুপুরে
ফুটবে । হিমু ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের
দিকে তাকাবে । নিজেকে দেখার চেষ্টা করবে
আকাশ আয়নায় ।

উৎসর্গ

নওশাদ চৌধুরী

প্রিয়বরেষু

অসমৰ প্ৰয়াটিক্যাল একজন মানুষ ।

মাথায় ব্যবসা নিয়ে নানান পৱিকল্পনা ।

তাৰপৱেও তাঁৰ মধ্যে আমি হিমুৰ

ছায়া দেখি এবং অবাক হই ।

“মধ্যদুপুর খুব আশ্চর্য সময়
তখন মানুষের ছায়া পড়ে না ।”



‘হিমু, তুই আমাকে একটা কিডনী দিতে পারবি ? আমার একটা কিডনী দরকার।’

মানুষজনের কথায় হকচকিয়ে যাওয়া কিংবা বিজ্ঞান হওয়া আমার স্বত্ত্বাবে নেই। তারপরেও মাজেদা খালার কথায় হকচকিয়ে গেলাম। ধানমন্ডি ২৭ নাথুর রোডে গাড়ি থামিয়ে তিনি আমাকে ধরেছেন। এখন কিডনী চাচ্ছেন। তাঁর কথার ভঙ্গিতে বিরাট তাড়াহড়া। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই কিডনী দরকার।

‘কথা বলছিস না কেন ? একটা কিডনী দিবি ?’

‘কেন দেব না ?’

‘থ্যাংকস, গাড়িতে উঠ। ড্রাইভারের পাশে বোস। চল বাসায় যাই।’

কিডনী কি বাসায় নিয়েই কেটে কুটে রেখে দেবে ? ডাক্তার কাটবে না-কি তুমি নিজেই কাটবে ? ধারালো টেরিলাইজড ছুরি-কাঁচি আছে তো ?’

‘অকারণে কথা বলিস কেন ? গাড়িতে উঠ।’

আমি গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে AC চলছে। আরামদায়ক শীতলতা। বাইরে বৈশাখ মাসের ঝৌঝোলা রোদ। শহর পুড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা। এই রোদের একটা নাম আছে— কাকমরা রোদ। কাকের মতো কষ্টসহিষ্ণু পাখিও এই রোদে হিট স্ট্রাকে মারা যায়। আমি আজ দুটা কাককে মরে থাকতে দেখেছি। মৃত্যুর পর কাকরা কোথায় যায় কে জানে। তাদেরও কি স্বর্গ-নরক আছে ? কাকদের স্বর্গ কেমন হবে ? আমার ধারণা তাদের স্বর্গে একটু পরপর থাকবে ডাস্টবিন। ডাস্টবিন ভর্তি ময়লা-আবর্জনা। ফেলে ছড়িয়ে আবর্জনা থাও। কেউ কিছু বলবে না।

খালা বললেন, ‘কিডনী দিতে হবে শুনে তুই দেখি ভ্যাবদা মেরে গেছিস। দুটা কিডনী মানুষের কোনো দরকার নেই। একটাতেই হেসেখেলে দিন চলে।’

আমি বললাম, ‘দুটা কিডনীতেও তো অনেকের চলে না। অন্যদেরটা নিতে হয়।’

খালা বললেন, ‘বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। এই গরমে তর্ক শুনতে ভাল লাগে না।’

আমি বললাম, ‘আচ্ছা, আর তর্ক করব না। শীত আসুক। নগর শীতল হোক। তখন তর্ক।’

‘আথের রস খাবি ? গরমের সময় আথের রস শরীরের জন্যে ভাল। অনেক এন্টি ওক্সিডেন্ট আছে। খাবি ?’

‘খাব।’

‘দুটা আখ থেকে এক গ্লাস রস পাওয়া যায়। হালকা সবুজ কালার। এর মধ্যে লেবুর রস আর সামান্য বিট লবণ দেয়, বরফের কুচি দেয়। খেতে অসাধারণ। আমি রোজ এক গ্লাস করে থাচ্ছি।’

‘জিস এখনো হয় নাই ?’

‘জিস হবে কোন দুঃখে ? আখওয়ালা আমার পরিচিত লোক। নাম সুলেমান। নরসিংহি বাড়ি। সে আমার সামনে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে আখ মাড়াইয়ের যত্ন ধূবে। আখও ধোয়া হবে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে। তার কাছ থেকে অনেক ফরেনারও আথের রস থায়।’

‘কোন দেশী ফরেনার সেটা হিসাবে রাখতে হবে। ইউরোপীয়ান ফরেনার না সোমালিয়ান ফরেনার।’

‘হিমু ! একবার বলেছি, আবারো বলছি, তুই বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। আমাকে ফরেনার শিখাবি না। আগামী আধাঘণ্টা একটা শব্দ উচ্চারণ করবি না। আমি যা বলব শুধু শুনে যাবি।’

‘ওকে।’

‘ওকে ফোকেও বলবি না।’

আমি নিঃশব্দে মাজেদা খালার সঙ্গে আথের রস খেলাম (জিনিসটা ভাল)। পাশেই ক্ষিরা কেটে বিক্রি করছে। খালা ক্ষিরা খেলেন। একজন কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখিয়ে বিক্রি করছিল। পাঁচ টাকা প্লেট। আমরা তাও খেলাম। সবশেষে তরমুজ।

খালা বললেন, ‘গরমের সব ওমুধ শরীরে নিয়ে নিলাম। শরীরের ডিহাইড্রেশন বন্ধ করার ব্যবস্থা হল। বুঝলি ?’

আমাৰ কথা বলা নিষেধ। কাজেই হ্যাস্চক মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম যে—‘বুৰোছি’। মাজেদা খালা, খাওয়া-দাওয়াৰ ফাঁকে ফাঁকে কিডনী প্ৰসঙ্গত খোলাসা কৱলেন। তাৰ পৰিচিত এক ভদ্ৰলোকেৰ দুটা কিডনীই নষ্ট। ডায়ালাইসিস কৱে দিন কাটছে। তাকে কিডনী দিতে হবে। তিনি সিঙ্গাপুৰে যাবেন কিডনী ট্ৰান্সপ্লান্ট কৱতে।

‘হিয়! তুইও উনাৰ সঙ্গে সিঙ্গাপুৰে যাবি। ফাঁকতালে তোৱ বিদেশ ভ্ৰমণ হয়ে যাবে। ভাল না?’

‘ভাল।’

‘পত্ৰিকায় প্ৰায়ই এ্যাড দেখি কিডনী বিক্ৰি কৱতে চায়। ওৱা ফকিৰ-মিসকিন। ওদেৱ কিডনী কেনাৰ মানে হয় না।’

‘ফকিৰ মিসকিনেৰ কিডনী আৱ প্ৰেসিডেন্ট বুশেৰ কিডনীতো একই।’

‘আবাৰ কথা বলা শুৱ কৱেছিস? তোকে না বললাম আধাৰণ্টা কথা বলবি না।’

‘সৱি।’

‘যাকে কিডনী দিবি তাৰ সঙ্গে যখন পৰিচয় হবে তখন তোৱ মনে হবে একটা কেন? দুটা কিডনীই দিয়ে দেই। এমন অসাধাৰণ মানুষ। বুৰোছিস?’

আমি হ্যাস্চক মাথা নাড়লাম।

খালা বললেন, ‘আমৱা ছোটবেলায় তাঁকে ডাকতাম, মুৱগি। উনি বই পড়াৰ সময় নিজেৰ অজান্তেই মুৱগিৰ মতো কক কক কৱেন এই জন্যে মুৱগি নাম। তোকে গাড়ি দিয়ে তাৰ কাছে পাঠাব। ঠিকানা দিয়ে পাঠালে তুই যাবি না। আমাকে বলবি—ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিস। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। যাকে কিডনী দিবি তাৰ নাম পল্টু। অসাধাৰণ মানুষ। পৰিচয় হলেই বুৰবি। উনাৰ দশটা কথা শুনলেই তুই তাৰ কেনা গোলাম হয়ে যাবি। তুই তাঁকে বলবি, আপনি আমাৰ কিডনী, হার্ট, লিভাৰ সব নিয়ে নিন।’

‘শধু চামড়াটা নিয়ে আমি বাঁচব কীভাৱে?’

‘কথাৰ কথা বলছি রে গাধা।’

য়াৱ নাম পল্টু এবং যাকে ডাকা হতো মুৱগি; তাৰ বিষয়ে আগ্রহী হওয়াৰ কাৰণ নেই। বিশেষ কৱে মাজেদা খালা যাকে অসাধাৰণ বলেন তাৱ বোকা হওয়াৰ সম্ভাবনা অনেক বেশি। বলা হয়ে থাকে, বুদ্ধিমানেৰ কাছ থেকে দশ হাত দূৱে থাকবে আৱ বোকাদেৱ কাছ থেকে একশ হাত দূৱে থাকবে। দূৱে থাকা সম্ভব হল না। খালা গাড়ি কৱে সেইদিনই পল্টু সাহেবেৰ কাছে পাঠালেন। খালা হচ্ছেন ‘ধৰ তঙ্গা মাৱ পেৱেক’ টাইপ মহিলা। দেৱি সহ্য কৱাৰ ঘোৱে না।

আমি পল্টু সাহেবের সামনে বসে আছি। ভদ্রলোক বেতের ইঞ্জিচেয়ারে শুয়ে আছেন। মাথার নিচে বালিশ। হাতে একটা চটি ইংরেজি বই নাম Love of Lucy লুসির প্রেম। বইয়ের কভারে একটা অর্ধনগ্ন বিশাল বক্ষা মেয়ের ছবি। মনে হচ্ছে এই মেয়েটিই লুসি। লুসি যার প্রেমে পড়েছে তার ছবিও কভারে আছে। বড়ি বিল্ডার টাইপ এক নিষ্ঠো। সে কুণ্ডলীরের ভঙ্গিতে লুসিকে জড়িয়ে ধরে আছে। কুণ্ডলীর লুসির ঘাড়ে চুম্ব খাচ্ছে। কিন্তু ছবি দেখে মনে হচ্ছে সে লুসির ঘাড় কামড়ে ধরেছে এবং ড্রাকুলার মতো রঞ্জ চুম্ব খেয়ে নিচ্ছে। লুসি তাতে মোটেই দৃঢ়থিত না, বরং আনন্দিত।

পল্টু সাহেব গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। ঠোটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকতে বলেছেন। মনে হচ্ছে লুসির প্রেমের শেষ পরিণতি না জেনে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। ভদ্রলোকের মুরগির মতো কক কক শব্দ করার কথা। তা করছেন না। কক কক শব্দ করার মত ভাল বোধ হয় এই বই না।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মতো, ত্যুৎকর রোগা। গায়ের রঞ্জ অতিরিক্ত ফরসা। কিছু কিছু চেহারা আছে দেখেই মনে হয় আগে কোথায় যেন দেখেছি। এ রকম চেহারা। আইনস্টাইনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটা মিল আছে। মাথায় বাবরি চুল। মুখে গৌফ। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন খালি গায়ে। লুঙ্গি পরেছেন। সেই লুঙ্গি দূরবর্তী বিপদ সংকেতের মতো হাঁটুর উপর উঠে আছে। কখন দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানে!

পল্টু সাহেব তার পা জলচৌকিতে রেখেছেন। পায়ের কাছে টেবিল ফ্যান। সেই ফ্যান শুধুমাত্র পায়ে বাতাস দিচ্ছে। ঘটনাটা কি বুঝা যাচ্ছে না। ঘটনা বুঝতে হলে লুসির প্রেম কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভদ্রলোক বাস করেন গুলশান এলাকার ফ্ল্যাট বাড়িতে। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। লেকের পাশে। একটা আধুনিক ফ্ল্যাট যতটা নোংরা রাখা সম্ভব তা তিনি রেখেছেন। মনে হচ্ছে ঘর পরিষ্কার করার কেউ নেই। যেখানে সেখানে বই পরে আছে। বেশ কিছু সিগারেটের টুকরা ভর্তি আধ খাওয়া চায়ের কাপ। একটা চায়ের কাপ মেঝেতে কাত হয়ে আছে; অনেকখানি জায়গা জুড়ে চা শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। পিংপড়োরা খবর পেয়ে গেছে। তবে রান্নাঘর তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। রান্নাঘরের ব্যবহার মনে হয় নেই।

বাথরুমে উঁকি দিলাম। বাথটাব ভর্তি ভেজা কাপড়। কমোডের কাছে সবুজ রঙের একটা তোয়ালে। বেসিনের উপর একটা পিরিচে আধ খাওয়া কেক এবং কলার খোসা। বোঝাই যাচ্ছে, পল্টু সাহেব বাথরুমে খাওয়া-দাওয়া করা দোষনীয় মনে করেন না।

ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা বলতে দেয়ালে একটি বিশাল সাইজের ধীরানো চার্লি চ্যাপলিনের ছবি। আরেকটা মাঝারি সাইজের আইনস্টাইনের ছবি। আইনস্টাইন জিভ বের করে ভেংচি কাটছেন।

পল্টু সাহেব লুসির প্রেম কাহিনী পড়ে শেষ করেছেন। বই পড়ে অনন্দিত হলেন কি-না বুঝতে পারছি না। ভুক্ত কুঁচকে আছে। তিনি বই মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে ফেললেন, ‘নাম বল।’

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘নাম লাভ অব লুসি।’

‘বইয়ের নাম জানতে চাচ্ছি না। বইয়ের নাম জানি। তোমার নাম বল।’

‘স্যার, আমার নাম হিমালয়।’

হিমালয় নাম শুনলে সবার মধ্যেই কিছু কৌতুহল দেখা যায়। তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। যেন মানুষের নাম হিসেবে হিমালয়, এভারেস্ট, মাউন্ট ফুজি জাতীয় নাম শুনে তিনি অভ্যন্ত।

পল্টু সাহেব ইঞ্জি চেয়ারের হাতলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, ‘চুরির অভ্যাস আছে?’

‘না।’

‘সত্যি বলছতো?’

‘জু স্যার।’

তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিতে দিতে বললেন, ‘তুমি সত্যি বলছ না। চুরির অভ্যাস নেই এমন মানুষ তুমি কোথাও পাবে না। বড় মানুষরা আইডিয়া চুরি করে। বিজ্ঞানীরা একজন আরেকজনের আবিষ্কার চুরি করেন। মানব জাতির সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে চুরির উপর বুঝেছ?’

‘জু স্যার।’

‘বেতন কত চাও বল? কত হলে পুষাবে সেটা বল। বেতন নিয়ে মূলামূলি করার সময় আমার নেই।’

আমি ধীরায় পড়ে গেলাম। মনে হচ্ছে বাসার চাকর হিসেবে তিনি আমাকে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলবেন।

‘আগে যে ছিল সে মহাচোর। টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার, ডিভিডি সেট নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওর নাম হাশেম। টাকা-পয়সাও নিয়েছে। কত নিয়েছে বের করতে পারি নি। তুমি কি চুরি করবে আগে ভাগে বল। আমি সোজাসুজি আলাপ পছন্দ করি। বল কি চুরি করবে?’

‘যা ছিল সবতো আগেরজন নিয়েই গেছে। আমি আর কি নেব। হাশেম ভাইজানতো আমার জন্যে কিছু রেখে যান নি।’

‘আগেরজনকে মাসে তিন হাজার টাকা দিতাম প্লাস থাকা-খাওয়া। চলবে ?’

‘জু স্যার, চলবে।’

‘রান্না করতে জান ?’

‘না।’

‘না জানলেও সমস্যা নেই। রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে তারা খাবার দিয়ে যায়। এটা একদিক দিয়ে ভাল। রান্নাঘরে চুলা জুলবে না। মসলার গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ আমার কাছে অসহ্য লাগে। কাপড় ধুতে পার ? ওয়াসিং মেশিন আছে। ওয়াশিং মেশিনে ধুবে।’

‘শিখিয়ে দিলে পারব।’

‘আরেক ঘন্টা। তোমাকে কে শিখাবে ? আমি নিজেও তো জানি না। ইনসট্রাকসান ম্যানুয়েল কোথায় গেছে কে জানে।’

আমি বললাম, ‘ধোপাখানায় কাপড় দিয়ে আসতে পারি।’

পল্টু সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ‘ভালো বুদ্ধি। গুড। ভেরি গুড। যাও কাজে লেগে পর।’

আমি কদমবুসি করে কাজে লেগে পড়লাম। কিডনী বিষয়ক জটিলতায় গেলাম না। তাড়াহড়ার কিছু নেই। পল্টু সাহেব অন্য একটা বই হাতে নিয়েছেন। বইটার নাম— The trouble with physics. লেখকের নাম Lee Smolin. কাজের ছেলে হিসেবে আমাকে এপ্রেন্টিশিপ দেওয়ার পর তিনি মনে হয় আমাকে মাথা থেকে পুরোপুরি দূর করে দিয়েছেন। আমার নামও ভুলে গেছেন। এ ধরনের মানুষরা কোনো কিছুই মনে রাখতে পারে না।

প্রথম চাকরি পেলে আত্মীয়-স্বজন বস্তু-বাস্তবদের খবর দিতে হয়। মিষ্টি খাওয়াতে হয়। মৃত বাবা-মা’র কবর জিয়ারত করতে হয়। যারা দূরে বাস করে, চিঠি লিখে তাদের কাছ থেকে দোয়া নিতে হয়। বিশাল কর্মকাণ্ড। আমি বিশাল কর্মকাণ্ডের শুরুতে মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। আবেগ জর্জরিত গলায় বললাম, ‘খালা আপনার দোয়া চাই। আজ চাকরিতে জয়েন করেছি।’

খালা বিশ্বিত হয়ে বললেন, ‘চাকরিতে জয়েন করেছি মানে কি ? কি চাকরি ?’

‘বাসাবাড়ির কাজ। সহজ বাংলায় চাকর। বেতন ভালো পেয়েছি— মাসে তিন হাজার। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঈদে বোনাস এবং কাপড়।’

‘হড়বড় করে কি বলছিস ? গরমে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?’

‘খালা, তুমি দু’একটা সহজ রান্না শিখিয়ে দিওতো। স্যারকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। হোটেলের রান্না থেরে স্যারের শরীর খারাপ হবে, এটা হতে দেয়া যাব না।’

‘হাঁকি পাঁকি কথা বন্ধ করবি? পল্টু ভাইজানের সঙ্গে দেখা করেছিস?’
‘করেছি। উনিই চাকরি দিলেন।’

খালা রাগি গলায় বললেন, ‘তুই ভাইজানকে টেলিফোনটা দেতো। আমি উনার সঙ্গে কথা বলি।’

আমি বললাম, ‘স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। উনি পড়াশোনা করছেন। আমার উপর ইনস্ট্রোকসান আছে— পড়াশোনার সময় যদি প্রেসিডেন্ট বুশও টেলিফোন করেন তাকে বলতে হবে— off যান। ইরাকে মানুষ মারা নিয়ে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেন। স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। স্যার ব্যস্ত।’

‘ছাগলামী করবি না। এক্ষুণি ভাইজানকে টেলিফোন দে। আর শোন, তোকে কিডনী দিতে হবে না। তুই মানুষ হিসেবে বিষাক্ত। আমি চাই না তোর শরীরের কোনো অংশ ভাইজানের ভেতর থাকুক।’

‘উনাকে বাঁচায়ে রাখতে হবে না?’

‘আমি অন্যখান থেকে কিডনী যোগাড় করব। বাংলাদেশে কিডনী পাওয়া কোনো ব্যাপার? ঘোল কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি কিডনী বিক্রির জন্যে কাষ্টমার খুঁজছে। ভাইজানকে টেলিফোন দে।’

আমি লাইন কেটে দিলাম।

চাকরি প্রাণ্তির আনন্দ সংবাদ আর কাকে দেয়া যায়। অবশ্যই বাদলকে। সেও নতুন চাকরি পেয়েছে, কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে ফিজিঞ্জ পড়াচ্ছে। তার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে ডাকছে পগা স্যার। এটা নিয়ে সে মানসিক সমস্যায় আছে। পগা ডাকের পেছনের কারণ বের করতে পারছে না।

‘কে, বাদল?’

‘হিমুদা তুমি? আমি জানতাম আজ দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে।’

‘চাকরি পেয়েছি এই খবরটা দেয়ার জন্যে টেলিফোন করলাম।’

‘তুমি করবে চাকরি— কি বলছ এসব? কোথায় চাকরি করছ?’

‘বাসার চাকর হিসেবে এক বাড়িতে দাখিল হয়ে গেছি। ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, হালকা রান্না— ডাল ভাত ডিম ভাজি।’

‘সত্যি বলছ?’

‘অবশ্যই।’

বাদল মুঞ্চ গলায় বলল, ‘আমার কাছে দারুণ একসাইটিং লাগছে। বাসা বাড়িতে কাজ নেয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। তোমাকে কেউ চিনুক বা না চিনুক, আমি চিনি। হিমুদা, কোথায় চাকরি করছ, কি করছ, একটু দেখে যাই?’

‘আজ না, অন্য একদিন খবর দিয়ে নিয়ে আসব। নতুন চাকরিতো, বসের মেজাজ মর্জি বুঝে নেই। শুরুতেই আঢ়ীয়-স্বজন বাড়িতে নিয়ে এলে বস রাগ করতে পারেন।’

‘ঠিক আছে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেদিনই চলে আসব। আচ্ছা হিমুদা, আমাকে যে পগা স্যার ডাকে তার কারণ তোমাকে বের করতে বলেছিলাম, বের করেছ?’

‘করেছি। ইংরেজি ইউনিভার্সিটিতো ছাত্ররা শুরুতে তোকে ডেকেছে হলি কাউ। সেখান থেকে হলি ডাঁকি। পবিত্র গাধা। পবিত্র গাধা থেকে পগা।’

‘বল কি?’

‘বাদল, রাখলাম, স্যারের কিছু লাগে কি-না খোঁজ নিতে হবে।’

‘তুমি কি সত্যি-সত্যিই বাসার চাকরের কাজ নিয়েছ?’

‘ইয়েস।’

বাদল মুঞ্চ গলায় বলল, ‘হাউ এক্সাইটিং। তোমাকে যতই দেখি ততই হিংসা হয়।’

আমি বললাম, ‘বাদল, টেলিফোন রাখি, আমার স্যার এখন মুরগির মতো কক কক শব্দ করছে। ঘটনা কি দেখে আসি।’

‘উনি মুরগির মতো কক কক করেন?’

‘সব সময় করেন না। ইন্টারেন্টিং কোনো বই পড়ার সময় করেন।’

টেলিফোন রেখে বিনীত ভঙ্গিতে স্যারের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার অবাক হয়ে বললেন, ‘কি ছুটি চাও?’

আমি বললাম, ‘নাতো।’

‘চাকরিতে জয়েন করেই সবাই ছুটি চায়। বাবা-মা’র সঙ্গে দেখা করে আসবে। বিছানা-বালিশ নিয়ে আসবে ইত্যাদি।’

‘ছুটি চাই না। পায়ে বাতাস দিচ্ছেন কেন এটা জানতে চাই।’

স্যার উৎসাহিত হলেন। ছাত্রকে শেখাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, ‘এরিস্টেলের নাম শনেছ?’

‘জু না স্যার। আমি চাকর মানুষ। আমি আমার মতো চাকর-বাকরদের কিছু নাম জানি। উনার মতো বড় মানুষের নাম জানব কিভাবে?’

‘উনি যে বড় মানুষ এই তথ্য তোমাকে কে দিল?’

‘আন্দাজ করেছি। ইংরেজি নামতো, ইংরেজি নামের মানুষৰা বড় মানুষ হয়।’

‘কচু হয়। যাই হোক এরিস্টেটল কোনো ইংরেজি নাম না। শ্রীক নাম। উনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। উনার ধারণা ছিল মানুষের মাথার একমাত্র কাজ এয়ার কভিশনিং-এর মতো বড়ি কভিশনিং। শরীরের তাপ ঠিক রাখা। যেহেতু এরিস্টেটলের মতো বড় মানুষ এই কথা বলেছেন, সবাই ধরে নিল মাথার এইটাই একমাত্র কাজ। মাথার কাজ নিয়ে কেউ আর কোনো চিন্তাভাবনাই করল না। পরের এক হাজার বছর এরিস্টেটলের কথাই বহাল রইল। এর থেকে কি প্রমাণিত হয় বল।’

‘প্রমাণিত হয় বড় বিজ্ঞানীদের সব কথা শুনতে হয় না।’

‘গুড়। তোমার বুদ্ধি ভাল। একশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ।’

‘স্যার, আপনার অসীম দয়া। কিন্তু পায়ে ফ্যানের বাতাসের ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার হয় নাই।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমার ধারণা শরীরের এয়ার কভিশনিং সিটেম হল পায়ে এবং কানে। খুব যখন ঠাণ্ডা পরে আমরা কি করি? কান ঢাকি এবং পায়ে ঘোজা পরি। ঠিক কি-না বল।’

‘জু স্যার, ঠিক।’

‘সেখান থেকে আমার ধারণা হয়েছে অতিরিক্ত গরমের সময় যদি পা এবং কান ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। সেই পরীক্ষাই করছি।’

‘স্যার, ফলাফল কি?’

‘ফলাফল পজিটিভ। যদিও কান ঠাণ্ডা করার কোনো বুদ্ধি পাও না। পা এবং কান দুটাই একসঙ্গে ঠাণ্ডা করতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতাম।’

‘কানে কি বরফ ঘসব স্যার? প্রতি দুই তিন মিনিট পর পর আপনার দুই কানে বরফ ঘসে দিলাম।’

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, ‘অত্যন্ত ভাল বুদ্ধি। তোমার বেতন আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ালাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা।’

‘স্যার, আপনার অসীম দয়া।’

‘অসীম কি জান?’

‘জানি না স্যার। এইটুকু জানি, অসীম হল অনেক বেশি।’

‘লেখাপড়া কিছু করেছ?’

‘অতি সামান্য।’

‘লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহ আছে? শিখতে চাও?’

‘শিখতে চাই না, স্যার।’

‘কেন চাও না?’

‘এত জেনে কি হবে? যত জ্ঞানই হোক মৃত্যুর পর সব শেষ। এই জন্যে ঠিক করে রেখেছি মানকের নকির এই দুই স্যারের কোচ্ছেনের আনসার শুধু শিখে যাব?’

পল্টু স্যার অবাক হয়ে বললেন, ‘এই দুইজন কে?’

‘স্যার, ফেরেশতা।’

‘বল কি? নাম শুনি নাইতো। উনারা কোচ্ছেন করেন না-কি?’

‘কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। উন্নর না জানলে বিরাট সমস্যা।’

‘কি প্রশ্ন বলতো?’

যেমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে— ‘তোমার প্রভু কে?’

পল্টু স্যার হতঙ্গ গলায় বললেন, ‘খুবই কঠিন প্রশ্ন তো। আসলেই তো আমার প্রভু কে? আমার প্রভু কি আমার সাব কনশাস মাইড, নাকি আমার কনশাস মাইড? কে আমাকে কন্ট্রোল করে?’

আমি বললাম, ‘স্যার, এরচেয়েও কঠিন প্রশ্ন আছে। যেমন— তোমার ধর্ম কি?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘সর্বনাশ! লোহার ধর্ম হল লোহা কঠিন। চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। মানুষের ধর্ম তাহলে কি? জটিল চিন্তার বিষয় তো!’

পল্টু স্যার চোখ বুঁজে চিন্তা শুরু করলেন। তাঁর মুখ থেকে কক কক শব্দ বের হতে লাগল।

সাতদিনে আমার বেতন তিন হাজার টাকা থেকে বেড়ে বেড়ে হল চার হাজার পঞ্চাশ। এবং এই সাত দিনে পল্টু স্যার সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তার সামারি এবং সাবস্টেন্স হচ্ছে—

ক. পল্টু স্যার অতি সজ্জন ব্যক্তি।

খ. পল্টু স্যার বেকুব ব্যক্তি।

ধরা যাক, কোনো এক সাংগঠিক পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হবে, আমি প্রতিবেদক। তাহলে আমি যা করব তা হচ্ছে— তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছেন এবং গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। এ রকম একটা ছবি তুলব লেখার সঙ্গে ঘাবার জন্যে। ছবির নিচের ক্যাপশানে— পাঠেই আনন্দ! মূল লেখাটা হবে এ রকম—

একজন নীরব জ্ঞান সাধক (কক কক ধর্মী)

তাঁর ভাল নাম আবু হেনা। পরিচিতজনদের কাছে পশ্টু
ভাই কিংবা পল্টুভাইজান। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। চিরকুমার
মানুষ। গুলশান এলাকার বত্রিশ' ক্ষয়ার ফুটের একটি
ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। ফ্ল্যাট বাড়ির আসবাব বলতে
একটা শোয়ার খাট, একটা ইজিচেয়ার। বইকে যদি
আসবাবের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে ইজিচেয়ার এবং খাট
ছাড়া তাঁর আছে ছোট-বড় প্রায় দশ হাজার আসবাব।
পড়ার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। হাতের কাছে যা পান
তাই পড়েন। বই হাতে না থাকলে তাঁর বুক ধড়ফড়
করে। হাঁপানির টান উঠে।

তিনি ঘুম থেকে উঠেন সকাল সাতটায়। এক কাপ
চা একটা টোস্ট বিসকিট থেয়ে পড়তে শুরু করেন।

দুপুর একটায় গোসল করেন। দুপুরের খাবার থেয়ে
ইজিচেয়ারে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে আবার
পড়তে শুরু করেন। সন্ধ্যা ছটায় পড়া বন্ধ করে এক কাপ
চা থেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে
সাতটার দিকে। আবার পড়তে বসেন— রাত এগারোটা
পর্যন্ত একটানা পড়ার কাজ চলে। এগারোটার পর রাতের
খাবার থেয়ে ঘুমাতে যান। রাত তিনটার দিকে ঘণ্টা
খানেকের জন্যে তাঁর ঘুম ভাঙে। এই সময়টাও তিনি নষ্ট
করেন না। পড়াশোনা করেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| উচ্চতা | : পাঁচ ফুট ৬ ইঞ্চি। |
| ওজন | : ষাট কেজি (আনুমানিক)। |
| প্রিয় রঙ | : কিছু নেই। |
| প্রিয় খাবার | : সবই প্রিয়। যা দেয়া হয় তাই খান। |
| প্রিয় ব্যক্তিত্ব | : এই মুহূর্তে তাঁর গৃহ্বত্য হিমু। |

মেডিকেল প্রোফাইল

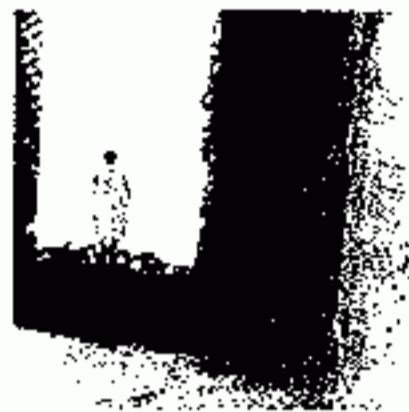
| | |
|-------------|-------------------|
| ব্লাড গ্রুপ | : A Positive. |
| কিডনী | : দুটাই অকেজো। |
| প্রেসার | : নরমাল। |
| ডায়াবেটিস | : নাই। |
| কলেষ্টেরেল | : বিপদসীমার নিচে। |

অর্থনৈতিক প্রোফাইল

নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকেন। এ ছাড়াও কয়েকটি ফ্ল্যাট
আছে। সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। ব্যাংকে প্রচুর টাকা।
তিনি চেক কেটে টাকা তুলতে পারেন না, কারণ
সিগনেচার মিলে না। পল্টু স্যার যে সিগনেচারে একাউন্ট
খুলেছেন সেটা ভুলে গেছেন। বাড়ি ভাড়ার নগদ টাকা যা
আসে তাতেই সংসার চলে। বাসায় বড় একটা লকার
আছে। লকারের কবিনেশন নাওয়ার স্যার ভুলে গেছেন বলে
লকার খোলা যাচ্ছে না। স্যার প্রতি শুক্ৰবারে আধুনিক
সময় বিভিন্ন নাওয়ারে চেষ্টা করেন। তাতে লাভ হচ্ছে না।

কক কক ধর্ম

বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। কিছু কিছু বই পড়ার সময় তিনি
কক কক জাতীয় শব্দ করেন। পছন্দের বই হলে এ
ধরনের শব্দ করেন, না-কি অপছন্দের বই হলে করেন—
তা এখনো বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কক কক শব্দটার সঙ্গে
মুরগির ডাকের সাদৃশ্য আছে।



গৃহভূত্য বিষয়ে আমার বাবার কিছু উপদেশবাণী ছিল। উপদেশবাণীর সার অংশ হচ্ছে— “মহাপুরুষদের কিছুকাল গৃহভূত্য হিসেবে থাকতে হবে।” তিনি ডায়েরিতে কি লিখে গেছেন তবহু তুলে দিচ্ছি। এই অংশটি তিনি মৃত্যুর আগে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে লিখেছেন। হাতের লেখা জড়ানো এবং অস্পষ্ট। মানুষের মানসিক অবস্থার ছাপ পড়ে হাতের লেখায়। আমার ধারণা তখন তাঁর মানসিক অবস্থাও ছিল এলোমেলো। লেখার শিরোনাম— হিজ মাস্টার্স ভয়েস। তিনি সব লেখাই সাধু ভাষায় লেখেন। এই প্রথম সাধু ভাষা বাদ দিয়ে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

হিমু, তুমি নিশ্চয় রেকর্ড কোম্পানি— হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড দেখেছ। তাদের মনোগ্রামে একটি কুকুরের ছবি আছে। কুকুরটা থাবা গেড়ে তার মনিবের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে প্রভুর প্রতি আনুগত্য ঝরে ঝরে পড়ছে।

সব মহাপুরুষদের কিছু দিন কুকুর জীবন যাপন করা বাধ্যতামূলক। সে একজন প্রভুর অধীনে থাকবে। প্রভুর কথাই হবে তার কথা। প্রভুর আদেশ পালনেই তার জীবনের সার্থকতা। প্রভুর ভাবনাই হবে তার ভাবনা। প্রভু মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাই সে সত্য বলে ধরে নিবে।

কুকুর ট্রেনিং-এ উপকার যা হবে তা নিম্নরূপ :

ক. জীবনে বিনয় আসবে। বিনয় নামক এই মহৎ গুণটি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমি অতি বিনয়ী মানুষকেও দেখেছি অহংকারের শুদাম। সেই শুদাম ভালাবদ্ধ থাকে বলে কেউ তার অহংকার প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

খ. ‘আনুগত্য’ কি তা শেখা যাবে। প্রতিটি মানুষ নিজের প্রতিই শুধু অনুগত। অন্যের প্রতি নয়। নিজের প্রতি আনুগত্য যে সর্বজনে ছড়িয়ে দিতে পারবে সেইতো মহামানব।

গ. মানুষকে সেবা করার প্রথম পাঠের শুরুত্ব।

কুকুর ট্রেনিং কিংবা গৃহভূত্য ট্রেনিং তোমাকে সেবা নামক আরেকটি মহৎ গুণের সংস্পর্শে আনবে। ফ্রেয়েস নাইটিংগেল না, তোমাকে সত্যি সেবা শিখতে হবে। ফ্রেয়েস নাইটিংগেল অসুস্থ মানুষদের সেবা করতেন। তারা এমনিতেই সেবার দাবিদার। তোমাকে সুস্থ মানুষকে সেবা করতে হবে।

আমি নিজে এখন অসুস্থ। সময় ঘনিয়ে আসছে এক্ষণ্প মনে হয়। তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং দিয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। যেসব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব না, আমার আদেশ, সেসব শিক্ষা নিজে নিজে গ্রহণ করবে।

এখন অন্য বিষয়ে কিছু কথা বলি— গত পরশু দুপুরে আমি তোমার মা'কে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন মোটেই শুরুত্বপূর্ণ কিছু না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন মন্তিক তার শৃতিগুলো নাড়াচাড়া করে। যাচাই-বাছাই করে, কিছু পুনর্বিন্যাস করে, তারপর শৃতির ফাইলে যত্ন করে রেখে দেয়। এই কাজটা সে করে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন। মন্তিকের এই কাজ-কর্মই আমাদের কাছে ধরা দেয় স্বপ্ন হিসেবে। ক্রয়েড সাহেব বলেছেন, সব স্বপ্নের মূলে আছে ঘোনতা। এই ধারণা যে কতটা ভুল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, এখন স্বপ্নের কথা বলি। আমি তোমার কিশোরী মা'কে স্বপ্নে দেখলাম। এটা কীভাবে সঙ্গে হল জানি না। কারণ তাকে আমি কিশোরী অবস্থায় কখনো দেখি নাই। যখন তাকে বিবাহ করি তখন তার বয়স বাইশ। সে একজন তরুণী।

আমি দেখলাম সে তার গ্রামের বাড়িতে। কুয়ার পাড়ে বসে আছে। তার সামনে এক বালতি পানি। সে চোখেমুখে পানি দিচ্ছে। তোমার মা অতি ক্লপবতীদের একজন— এই তথ্য মনে হয় তুমি জান না। কারণ, তার মৃত্যুর পর আমি তার সমস্ত ফটোগ্রাফ নষ্ট করে দিয়েছি। তার শৃতি জড়িত সব কিছুই ফেলে দেয়া হয়েছে। কারণ শৃতি মানুষকে পিছনে টেনে ধরে। মহাপুরুষদের পিছুটান থেকে মুক্ত থাকতে হয়।

স্বপ্নের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তোমার মা চোখেমুখে পানি দিয়ে উঠে দাঁড়ানো মাত্র আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তোমার মা অত্যন্ত আনন্দিত গলায় বলল, ‘তুমি একা এসেছ, আমার ছেলে কই?’

আমি বললাম, ‘তাকে ঢাকা শহরে রেখে এসেছি।’

সে করুণ গলায় বলল, ‘আহারে, কত দিন তাকে দেবি না! সে না-কি হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। এটা কি সত্যি?’

‘হ্যাঁ সত্যি।’

‘তুমি তাকে সুন্দর একটা শার্ট কিনে দিও। একটা প্যান্ট কিনে দিও। এক জোড়া জুতা কিনে দিও।’

‘আচ্ছা দিব।’

তোমার মা তখন কাঁদতে শুরু করে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘ওর কি কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে? কোনো মেয়ে কি ভালোবেসে তার হাত ধরেছে?’

আমি বললাম, ‘না। সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে। তার জন্যে নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ।’

তোমার মা চোখের পানি মুছে রাগী রাগী গলায় বলল, ‘সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে, না কচু করছে। তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। আমি থাবড়ায়ে তার মহাপুরুষগিরি ছুটায়ে দিব।’

স্বপ্নের এই জায়গায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্ন যে এক ধরনের ভ্রান্তি তা আমি জানি। তারপরেও স্বপ্নদর্শনের পর পর আমার মধ্যে কিছু আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল। আমার চক্ষু সজল হল। মনে মনে বললাম,

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি
অরণ্যং তেন গত্ব্যং
যথারণ্যং তথা গৃহস।

‘বাবা হিমু, এখন তোমাকে একটি বিশেষ কথা বলি— তোমার মায়ের একটি আট ইঞ্জিং বাই বার ইঞ্জিং ছবি এবং তার লেখা ডায়েরি আকারে একটা খাতা আমি গোপনে রেখে দিয়েছি। একটা খামে সিলগালা করে রাখা। যে তোমকে আমি ঘুমাই সেই তোষকের ভেতরে সিলাই করে রাখা আছে। তুমি খামটি সংগ্রহ করবে। যে দিন কোনো কারণে তোমার হৃদয় সত্যিকার অর্থেই আনন্দে পূর্ণ হবে সেদিন খামটা খুলবে। তবে একবার খাম খুলে ফেলার পর ছবি, খাতা এবং খাম আগন্তে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেহেতু একবার দেখার পর সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে সেই কারণেই তুমি কোনোদিন খামটা খুলতে পারবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হা হা হা। একে কি বলে জান? একে বলে থেকেও নাই।’

বাবার উপদেশ মেনে এক মাস গৃহত্যের কাজ করে আজ বেতন পেয়েছি। পল্টু স্যার সারাদিনের ছুটি দিয়েছেন। আজ তার ডায়ালাইসিসের দিন। সারাদিন কাটাবেন হাসপাতালে। রাতে ফিরবেন, আবার নাও ফিরতে

পারেন। শরীর বেশি খারাপ লাগলে হাসপাতালেই থেকে যাবেন। তাঁর অবস্থা দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ডাক্তাররা ‘কিউনী ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই’ এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

পল্টু স্যার বলেছেন, অন্যের কিউনী শরীরে নিয়ে বাঁচার তিনি কোনোই কারণ দেখছেন না। তাঁর মতে ঘুম যেমন ভয়াবহ কিছু না, মৃত্যও না। বরং ঘুমের চেয়ে ভালো। ঘুম এক সময় ভাণ্ডে, বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। গরম, ঘাম, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা, বাথরুম নামক অসুবিধায় বাস করতে হয়। মৃত্যুতে এই সমস্যা নেই। তাঁর একটাই সমস্যা— মৃত্যুর পর বইগুলো সঙ্গে থাকবে না।

অনেকদিন পর রাত্তায় হাঁটছি। গরমটা ভালো লাগছে, গায়ের ঘামের গন্ধও ভালো লাগছে। কঠিন রোদের আলাদা মজা আছে।

এফডিসির কাছের রেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন যাবে সেই দৃশ্য দেখব। ছুটত্তে ট্রেনের সঙ্গে মনের একটা অংশও ছুটে যায়, সেই অনুভূতি অন্য রকম। ট্রেন কখন আসবে জানি না। অপেক্ষা করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। হাতে রাত আটটা পর্যন্ত সময়। আমি আগ্রহ নিয়ে চারপাশ দেখছি। একটা রিকশায় মায়াকাড়া চেহারার শ্যামলা মেয়ে বসে আছে। বৈশাখের দুর্দান্ত রোদেও মেয়েটা রিকশার হড় তোলেনি। রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। মেয়েটাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে কাঁদতে কাঁদতে এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে আসছে। প্রকৃতি মানুষের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদবে, তার চোখে পানি আসবে এবং আনন্দ পেলে সে হাসবে, তার দাঁত দেখা যাবে— এই ব্যবস্থা। প্রকৃতি এই কাজটা কেন করল?

আমার ধারণা প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করেছে যেন মানুষ তার দুঃখ এবং আনন্দ লুকাতে না পারে। যেন অন্যরা টের পেয়ে যায়। দুঃখ এবং আনন্দ ভাগ করার জন্যে এগিয়ে আসে।

রেল ক্রসিং-এর গেট পরে গেছে। মেয়েটার রিকশা থেমে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি রিকশার দিকে। আমার হঠাৎ মনে হল— রিকশার ভাড়া দেবার মতো টাকা মেয়েটার কাছে নেই। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা ভয়াবহ ক্ষুধার্ত। রাতে সে কিছু খায় নি। এত বেলা হয়েছে এখনো কিছু খায় নি।

মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে পড়েছে। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে কি যেন বলছে। মেয়েটার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়েছে। সে হতাশ ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম, ‘ভাড়া কত হয়েছে?’

রিকশাওয়ালা বলল, ‘একশ টাকা।’

আমি বললাম, ‘ঢাকা শহরে রিকশার ভাড়া একশ টাকা এই প্রথম শুনলাম।’

রিকশাওয়ালা বলল, ‘স্যার, আমি ইনারে নিয়া সকাল থাইকা ঘূরতাছি। এর বাড়িতে যায়, তার বাড়িতে যায়। কানতে কানতে ফিরা আসে, যাত্রাবাড়ি গেলাম। মগবাজার গেলাম। রামপুরা গেলাম— এখন আপনি বিবেচনা করেন! একশ টাকা কমই চাইছি।’

আমি বললাম, ‘আমারো তাই ধারণা। এই নাও রিকশা ভাড়া একশ টাকা। আর এই নাও বিশ টাকা। বরফ দেয়া লাছি খাও। গরমে আরাম হবে।’

রিকশাওয়ালা এই প্রথম ভালোভাবে আমার দিকে তাকালো এবং জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল, ‘হিমু ভাই, মাফ দেন। আপনেরে চিনতে পারি নাই।’ সে নিচু হয়ে কদমবুসি করল।

মেয়েটা হতভন্ন। আশেপাশের লোকজনও কৌতুহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ট্রেন এসে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি ট্রেনের দিকে—

বৃষ্টি দেখলেই যেমন ছেলেবেলার গান ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ মনে পড়ে, ট্রেন দেখলেই ট্রেনের ছড়া মনে পড়ে—

রেল গাড়ি বামাবাম
পা পিছলে আলুর দম
ইঞ্চিশনের মিষ্টি কুল
শর্খের বাগান গোলাপ ফুল।

ট্রেন চলে গেছে। রেল গেটের জটলা শেষ। শুধু আমি, মায়াবতী তরুণী এবং রিকশাওয়ালা আটকে আছি।

রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে বলল, ‘হিমু ভাই কি আমারে চিনেছেন? আমি ছামছু। আমার শেয়ের নাম সাগরিকা। আপনার কারণে মেয়েটার জীবন রক্ষা হয়েছিল। চিনেছেন হিমু ভাই?’

‘হ্যাঁ।’

‘একটা পরীক্ষা আছে না, পাস করলে মাসে মাসে টেকা পায়। সাগরিকা সেই পরীক্ষা পাস করছে। টেকা পাওয়া শুরু করছে। এইটা সেইটা কিনতে চায়। আমি বলেছি, খবরদার! আগে হিমু ভাইরে পছন্দের কিছু কিন্যা দিবি। তারপর অন্য কথা। ঠিক বলেছি না?’

‘হ্যাঁ।’

‘এখন বলেন আপনার পছন্দের জিনিস কি ? আইজই কিনব ।’

চিত্তা-ভাবনা করে বলি । হট করে বলতে পারব না । আগে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে । ক্ষুধায় জীবন যাওয়ার উপক্রম । ঢাকা শহরের সবচে ভালো মোরগ-পোলাও কোথায় পাওয়া যাবে ?’

‘পুরান ঢাকায় যাইতে হবে । সাইনি পালোয়ান ।’

‘চল যাই ।’

আমি রিকশায় উঠে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘চল, মোরগ-পোলাও খেয়ে আসি ।’

মেয়েটা চোখ-মুখ খিচিয়ে কঠিন গলায় বলল, ‘আপনি আমাকে মোরগ-পোলাও খাওয়াবেন কেন ?’

আমি বললাম, ‘তোমার ক্ষিধে লেগেছে এই জন্যে ।’

মেয়েটি গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, ‘আমার ক্ষিধে লাগলে আপনি কেন আমাকে খাওয়াবেন ?’

আমি বললাম, ‘ঝামেলা করবে না । সারাদিন রিকশা নিয়ে ঘুরেছ, ভাড়া দিতে পার নি, আবার বাগড়া । আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব । এর মধ্যে যদি রিকশায় না উঠ তিনটা থাপ্পর দিয়ে চলে যাব । এক... দুই...

তিনি বলার আগেই মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে রিকশায় উঠল । রিকশাওয়ালা বলল, ‘আপনেরে চিনে নাই, এই জন্য ডং করছে । চিনলে লাফ দিয়ে কোলে উইঠ্যা বসত ।’

আমি বললাম, ‘তোমার ঐ দোকানে আইটেম আর কি পাওয়া যায় ?’

রিকশাওয়ালা ঘহানন্দে রিকশার প্যাডেল চাপতে চাপতে বলল, ‘গ্লাসি পাইবেন । খাসির মাংস দিয়া বানায় । এমন গ্লাসি আপনে বেহেশতেও পাইবেন না ।’

‘মোরগ-পোলাওয়ের সঙ্গে গ্লাসি যায় ?’

‘অবশ্যই যায় । কেন যাইব না ? চ্যালচ্যালায় যায় ।’

‘ঠিক আছে, মোরগ পোলাও এবং গ্লাসি সাথে আর কি ?’

‘কোয়েল পাখির রোস্ট খাইবেন ? পেটের ভিতরে থাকবে পাখির ডিম ।’

‘অবশ্যই খাব ।’

‘দাম আছে কিন্তু ।’

‘দাম কোনো বিষয়ই না । একদিনইতো খাব । রোজ রোজ তো খাচ্ছি না ।’

মেয়েটা শক্ত হয়ে বসে আছে । ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুটা দিশেহারা । তার হাতের আঙুল কাঁপছে । খুব সম্ভব টেনশন এবং ক্ষুধার কারণে ।

‘আমার নাম কি ?’

‘আমার নাম জেনে কি করবেন ?’

‘আমি একজনকে মোরগ-পোলাও, প্লাসি এবং ডিমসহ কোয়েল পাখি
খাওয়াবো, তার নাম জানব না ?’

‘আমার নাম রানু !’

‘থাক কোথায় ?’

‘মহিলা হোটেলে। হাতিরপুলের কাছে।’

‘মহিলা হোটেলে কত টাকা বাকি পড়েছে ? আমার ধারণা মহিলা
হোটেলের বাকি শোধ করার জন্যেই তুমি ঘুরছ। টাকা জমা দেবার আজই
কি শেষ দিন ?’

রানু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘আপনি জেনে কি
করবেন ? আমাকে টাকাটা দিবেন ?’

‘হ্যাঁ। দেব।’

‘বিনিময়ে আমাকে কি করতে হবে ? আপনার সঙ্গে শুভে হবে ?’

আমি কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বললাম,
‘হ্যাঁ।’

রানু এখন মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ
রক্তবর্ণ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি
বললাম, রানু শোন। তুমি ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছ। সমস্যা থেকে বের
হওয়ার জন্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে টাকা রোজগারের চিন্তা করছ বলেই
আমাকে এমন কৃৎসিত কথা বলতে পারলে।

রানু ফৌপাতে ফৌপাতে বলল, ‘সরি।’

‘আমি তোমাকে একটা ঠিকানা লিখে দেব। এই ঠিকানায় চলে এসো,
দেখি কোনো চাকরি দেয়া যায় কি-না।’

‘আমার জন্যে আপনাকে কিছু করতে হবে না।’

‘আচ্ছা যাও— কিছু করব না।’

‘হোটেলের টাকাটা আপনার কাছ থেকে ধার হিসেবে নেব। যথা সময়ে
ফেরত দেব। আমার তিন হাজার টাকা লাগবে; তিন হাজার টাকা কি আছে
আপনার সঙ্গে ?’

‘আছে।’

‘আরেকটা কথা আপনাকে বলি— আপনি নিজেকে যতটা ভালো মানুষ
প্রমাণ করতে চাইছেন ততটা ভালো মানুষ আপনি নন।’

‘কিভাবে বুঝলে ?’

‘আমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি। সে ভালো না মন্দ।’

‘কখন থেকে পার ? ছেটবেলা থেকে ?’

রানু জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। তার শরীরের কাঁপুনি থেকে বুঝতে পারছি সে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, ‘টাকাটা যে আমাকে ফেরত দেবে। কিভাবে দেবে ? তোমার ভাবভঙ্গি পরিষ্কার বলছে তুমি গভীর জলে পড়েছ। কারো কাছ থেকে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?’

‘আপনার টাকা পেলেইতো হল। কোথেকে পাচ্ছি সেটা জেনে কি করবেন ? যাই হোক আপনাকে বলছি— আমি কিডনী বিক্রি করছি। এক ভদ্রলোক কিনবেন বলে কথা পাকা হয়েছে। ক্রস ম্যাচিং আরো কি কি যেন আছে, সব করা হয়েছে।’

‘কত টাকায় বিক্রি করছ ?’

‘এক লাখ টাকা। যে এজেন্ট বিক্রির ব্যবস্থা করেছে তাকে দশ হাজার দিতে হবে। আমি পাব নববই হাজার।’

‘নববই হাজারে কিডনী খারাপ না। টাকাটা হাতে পাচ্ছ কবে ?’

‘এই মাসের আঠারো তারিখ অর্ধেক টাকা পাব। বাকি অর্ধেক ট্রামপ্লাটের পরে।’

‘যিনি তোমার কিডনী কিনছেন তার নাম জান ?’

রানু বলল, ‘কার জন্যে কিডনী কেনা হচ্ছে তা আমি জানি না। মাজেদা বলে একজন মহিলা সব ব্যবস্থা করছেন। নিউ ইঙ্কাটনে থাকেন।’

আমি বললাম, ‘ইলি কাউ। পবিত্র গাভী।’

রিকশাওয়ালা বলল, ‘গাভীর কথা কি বললেন স্যার ?’

‘গাভীর কথা কিছু বলি নাই। তুমি রিকশা চালাও।’

রানু খাওয়া-দাওয়ায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল, ‘আমি একটা মিষ্টিপান খাব।’ তার চোখে চকচকে ভাব আগে ছিল না, এখন চলে এসেছে। তাকে পান কিনে দেয়া হল। সে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, ‘আমি এমিতে পান খাই না। শুধু বিয়েবাড়িতে গেলে পান খাই। একবার জর্দা দেয়া পান খেয়ে বিয়েবাড়িতে অঙ্গান হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বান্ধবীর বিয়ে। ওর নাম হাসি। আমরা ওকে ক্ষেপানোর জন্যে বলতাম—

হাসি।

রঞ্জব আলির খাসি।’

‘রঞ্জব আলিটা কে ?’

‘রজব আলি কেউ না। এমি একটা নাম। মজার ব্যাপার কি জানেন ?
ওর বিয়ে ঘার সঙ্গে হয়েছে তার নাম রজব আলি। গার্মেন্টস ফ্যাট্টির
ষ্যানেজার। অস্তুত না ?’

‘কিছুটা অস্তুত ।’

রানু বলল, ‘মাঝে মাঝে অস্তুত ঘটনা ঘটে। আজ যেমন ঘটেছে। যখন
খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে হল আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।
আজকের তারিখটা জানেন ?’

‘সতেরোই মে ।’

‘আজ আমার বাবার মৃত্যু দিন। উনি মারা গিয়েছিলেন দুপুর দু’টায়।
আমি যখন খাওয়া শুরু করি তখন বাজে দুপুর দু’টা। আমি ঘড়ি
দেখেছিলামতো, আমি জানি। খাবার সময় আমি যে কাঁদছিলাম আপনি
দেখেছেন ? প্লেটে কয়েক ফোটা চোখের পানি পড়েছিল ।’

‘দেখেছি ।’

‘কাঁদছিলাম, কারণ আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, আমার বাবা ঠিক আমার
পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন— মা !
আরাম করে ভাত খা। খাওয়ার সময় প্লেটে চোখের পানি ফেলতে নেই। এ
রকম কেন মনে হল শুনতে চান ?’

‘চাই ।’

‘আরেক দিন বলব। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা,
বলুনতো, আমি কি দেখতে খারাপ ?’

‘খারাপ না, তবে রসগোল্লাও না ।’

‘কিছু একটা আমার মধ্যে আছে। ভয়ংকর রিপালসিভ কিছু। এখন পর্যন্ত
কোনো ছেলে আমার প্রেমে পড়ে নি। অথচ প্রতিরাতে ঘুমুতে যাবার সময়
আমি চিন্তা করি— একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে আমার শন ভুলাবার
জন্যে হাস্যকর সব কাওকারখানা করছে ।’

‘কি রকম হাস্যকর কাওকারখানা ?’

‘একেক রাতে একেক রকম ভাবি। কাল রাতে ভেবেছি— একটা ছেলে
ঞ্জে নিয়ে আমার ঘরের বাথরুমে চুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে— তুমি
যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হও, তাহলে আমি ঞ্জে দিয়ে আমার
হাতের শিরা কেটে ফেলব ।’

‘তুমি রাজি হয়েছ ?’

‘অবশ্যই রাজি হব! যে কোনো ছেলে এই ধরনের কথা বললে আমি
রাজি হব ।’

‘না, তা হবে না। রিকশাওয়ালা ছামছু বললে রাজি হবে না।’

রানু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ‘রিকশাওয়ালাকে আপনি টেনে আনলেন কেন? আপনিতো অস্তুত মানুষ।’

আমি বললাম, ‘তুমি যখন রাজি হলে তখন ছেলেটা কি করল?’

রানু বলল, ‘আপনাকে আর কিছুই বলব না। এতক্ষণ বক বক করেছি বলে নিজের উপর রাগ লাগছে। আমি আপনার সঙ্গে ফেরত যাব না। আলাদা রিকশা নিয়ে যাব।’

‘তাহলে বিদায়।’

রানু বলল, ‘বিদায়। আপনি আমাকে যত্ন করে থাইয়েছেন, কোন একদিন সেটা আমি শোধ করব। যত তাড়াতাড়ি পারি করব। প্রমিজ।’

রানু চলে গেল। আমিও রওনা হলাম। হাতে অনেক সময়। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করা দরকার। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করার পর হাসপাতালে চলে যাব। দেখে আসব পল্টু স্যারকে। ইঁটতে ইঁটতে যাচ্ছি, কারণ হাত খালি। টাকা যা ছিল রানুকে দিয়ে দিয়েছি। তিন হাজার টাকা দেবার কথা। তারচে বেশিই দিয়েছি। কত বেশি বুঝতে পারছি না।

ভরপেট খাওয়ার পর কড়া রোদে ইঁটার অন্য রকম মজা আছে। মনে হয় নেশা করে ইঁটছি। ছাতিম গাছের ফুলের গন্ধ শুকলে যে রকম নেশা হয় সে রকম নেশা।

মাজেদা খালা দরজা খুলে বললেন, তোর একি অবস্থা? মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে গোসল করেছিস। এক্ষুণি বাথরুমে চুকে পর। সাবান ডলে গোসল দে। তার আগে লেবুর সরবত করে দিচ্ছি। সরবত খা। ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে থাক, শরীর ঠাণ্ডা হোক।

আমি ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে লাগলাম। মাজেদা খালা ঘরের এসিও ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর দ্রুত শীতল হচ্ছে। রোদে ইঁটার নেশা ভাবটা কেটে যাচ্ছে।

মাজেদ খালা সরবত নিয়ে এলেন। চিনির সরবত না, লবণের সরবত। প্রচুর ঘাম হলে এই সরবতই না-কি খাবার বিধান।

‘তুই কি আমার কাছে কোনো কাজে এসেছিস?’

‘ইঁ।’

‘আমারো তাই ধারণা। ভর দুপুরে বিনা কাজে আসার মানুষ তুই না। কাজটা কি?’

‘বিশেষ একটা ধর্ম নিয়ে আমি গবেষণা করছি। তুমি এই বিষয়ে কি জান তাই জানতে এসেছি।’

‘ধর্ম বিষয়ে আমি কি জানব। তোর খালু সাহেব জানতে পারেন। সে দেশে নেই। জাপান গিয়েছে।’

‘তুমি যা জান তাই শুনি।’

‘কি ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাস?’

‘কক কক ধর্ম।’

‘কক কক ধর্ম আবার কি? এই প্রথম এমন এক ধর্মের নাম শুনলাম।’

‘পল্টু স্যার যে কক কক শব্দ করে এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।’

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘সহজ কথা সহজে বলতে পারিস না? আমি ভাবলাম কি-না কি ধর্ম।’

‘আমি যতদূর জানি কক কক করার কারণে স্যারের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি?’

মাজেদা খালা বললেন, ‘তোকে কে বলেছে? পল্টু ভাইজান বলেছেন?’

‘হ্যাঁ। স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার বিয়ে করেন নি কেন? তখন বললেন।’

মাজেদা খালা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ‘কার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল, সেটা কি বলেছে?’

‘না।’

‘যাক, ‘এইটুকু সেঙে তাহলে আছে।’

‘তোমার সঙ্গেই বিয়ে হতে যাচ্ছিল?’

‘হ্যাঁ। বিরাট বড়লোকের ছেলে, গাড়ি-বাড়ি এই সব দেখে বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আর আমি নিজেও তাকে পছন্দ করতাম। পছন্দ করার মতোই মানুষ। বিয়ে করতে এসেছে। বরযাত্রীর সঙ্গে বসেছে। টেনশনের কারণে মনে হয় কিছু একটা হয়েছে— শুরু করল কক কক।

আমার বড় চাচা মিলিটারি কর্নেল। তিনি বললেন, জামাই কক কক শব্দ করছে কেন? সমস্যা কি?

পল্টু ভাইজান বড় চাচার হংকারে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। জোড়ে জোড়ে কক কক করতে লাগলেন। এত জোড়ে যে, ভেতর বাড়ি থেকে শুনা যায়। বিয়ে ভেঙে গেল।’

আমি বললাম, ‘পল্টু স্যারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খারাপ হতো না। মানুষটা শুধু যে ভাল তা-না। অন্য রকম ভাল।’

মাজেদা খালা চাপা গলায় বললেন, ‘জানি।’

আমি বললাম, ‘উনার শোবার ঘরে তোমার যে একটা বাঁধানো ছবি
আছে এটা কি জান ?’

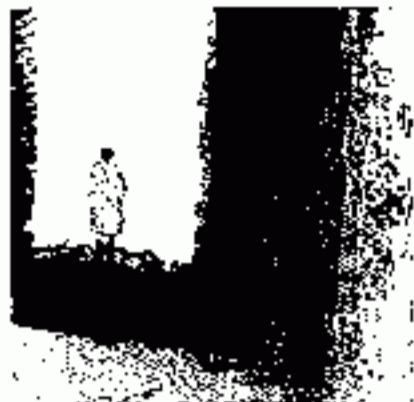
‘নাতো !’

‘বয়সকালে তুমি যে কি ঝুপবতী ছিলে ছবিটা না দেখলে বিশ্বাস করাই
মুশ্কিল । প্রথম কিছুদিন আমি চিনতেই পারিনি যে এটা তোমার ছবি ।’

মাজেদা খালা বললেন, ‘তোর দায়িত্ব হচ্ছে আজই ছবিটা সরিয়ে ফেলা ।
অন্য লোকের স্ত্রীর ছবি তিনি কেন নিজের ঘরে রাখবেন । হিঃ । আজ দিনের
মধ্যে তুই ছবি সরাবি ।’

আমি বললাম, ‘এই কাজটা আমি করব না, খালা । বেচারার কিছুইতো
নেই । থাকুক না একটা ছবি ।’

মাজেদা খালা চট করে আমার সামনে থেকে সরে গেলেন । বুঝতে
পারছি হঠাৎ তার চোখে পানি চলে এসেছে । প্রকৃতি মাঝে মাঝে মানুষকে
এমন বিপদে ফেলে । চোখে পানি আসার সিষ্টেম না থাকলে জীবন ধাপন
হয়তো সহজ হতো ।



হাসপাতালের ৩১ নম্বর কেবিনে পল্টু স্যার হতাশ ভঙ্গিতে শয়ে আছেন। তাঁর গায়ে হাসপাতালের হাস্যকর সবুজ জামা। এই জামায় রোগীর সুবিধার জন্যে বোতাম থাকে না। পেছন দিকে ফিতা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেই ফিতা বাঁধতে হয় বলে বেশির ভাগ সময় আন্দাগিটু লেগে যায়। প্রয়োজনের সময় এই জামা খোলা যায় না। রোগীতো পারেই না, নার্সরাও পারে না।

পল্টু স্যারের হাতে টিভির রিমোট কন্ট্রল। তিনি তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। টিভি কিন্তু বন্ধ। ফিনাইল গন্ধমুক্ত হোটেলধর্মী হাসপাতাল। ইদানীং এই ধরনের হাসপাতাল বাংলাদেশে প্রচুর হচ্ছে। এই হাসপাতালগুলোর লম্ফ রোগীকে ফাইভ স্টার হোটেলের আনন্দে রাখা। চিকিৎসা অনেক পরের ব্যাপার। সমস্যা হচ্ছে রোগীরা চাচ্ছে চিকিৎসা। ফাইভ স্টার হোটেলে আরামে থাকতে চাইলে তারা ফাইভ স্টার হোটেলেই যেত। হাসপাতালে ভর্তি হতো না।

‘স্যার! টিভিতে কি দেখছেন?’

পল্টু স্যার চমকে আমার দিকে তাকিয়েই হাহাকার ধ্বনি করলেন, ‘হিমালয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি চোখে অঙ্ককার দেখছি। মহাসর্বনাশ।’

‘কি সর্বনাশ হয়েছে?’

‘হাসপাতালে পড়ার জন্যে একটা প্যাকেটে বই আলাদা করে রেখেছিলাম। প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। বই ছাড়া রাত কাটাবো কিভাবে?’

‘আমার ঝুলির ভেতর একটা গল্লের বই আছে। এতে কাজ চলবে?’

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, ‘অবশ্যই কাজ চলবে। আমার বই হলেই চলে। কি বই সেটা কোনো ব্যাপার না।’

স্যার, আমি যে বইটা এনেছি তার নাম ‘বিড়াল আমার সিমকার্ড দুধে ভিজিয়ে খেয়ে ফেলেছিল।’ অতি আধুনিক লেখা।

পল্টু স্যার বললেন, ‘সিমকার্ড বিড়াল দুধে ভিজিয়ে কিভাবে খাবে? কাউটা ধরবে কিভাবে? থাবা দিয়েতো কিছু ধরা যায় না।’

‘বিড়াল দাতে কামড় দিয়ে কার্ড ধরেছিল। সেই ভাবেই দুধের বাটিতে ডুবিয়েছে।’

পল্টু স্যার বিশ্বিত হয়ে বললেন, ‘বিড়াল সিয়কার্ড খায় এটাই জানতাম না। ছাগল সব কিছু খায় এটা জানি— আচ্ছা শোন, এটা কি হাসির বই ?’

‘হাসির বই না, স্যার। খুব সিরিয়াস বই। পরাবাস্তবতা।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমার সমস্যা নাই। শুধু হাসির ব্যাপারগুলো নিয়ে সমস্যা। একটা জোকস-এর বই অনেক দিন আগে পড়েছিলাম— কিছুই বুঝতে পারি নাই। তোমাকে একটা বলব ? তুমি কিছু বুঝতে পার কি-না।’

‘বলুন।’

‘এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। প্রেমিকা ব্যাক ভিউ মিরর দেখিয়ে বলল, আয়নাটা এমনভাবে ফিট করেছে যে, মুখ দেখা যায় না। চুল ঠিক করতে পারছি না।’ প্রেমিক বলল, ‘ঐ আয়নাটা পেছন দেখার জন্যে।’ তখন প্রেমিকা বলল, ‘ছিঃ ছিঃ কমল ভাই। আপনি এত অসভ্য কেন ?’ এই হল গল্প বুঝালে। এখন তুমি বল, ছেলেটা অসভ্যতা কি করেছে ? সত্যি কথা বলার মধ্যে কোনো অসভ্যতা আছে ?’

‘জু না।’

‘আমি গল্পটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিছুই বের করতে পারি নাই। আচ্ছা শোন, এমন কি হতে পারে যে প্রেমিক গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে এটাই হাসির ব্যাপার ?’

‘হতে পারে।’

‘আমিও তাই ভেবেছি। মেয়েটা গাড়ি চালানো শিখবে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে। কিংবা তাদের বাসার ড্রাইভারের কাছে। প্রেমিকের কাছে কেন ?’

‘যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন, স্যার।’

‘তারপরেও মেয়েটার আচরণ ঠিক না। সে ছিঃ ছিঃ করে উঠবে কেন ? অবশ্য মেয়েটার মেজাজ খারাপ। সে মুখ দেখতে পারছে না। মাথার চুল ঠিক করতে পারছে না। মেজাজ খারাপের কারণে সে ছিঃ ছিঃ বলেছে।’

‘স্যার, হতে পারে। আপনি বরং বই পড়ুন। কিংবা ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আজ আপনার শরীর খারাপ।’

‘ঠিকই বলেছ। চোখ জ্বালা করছে। তুমি বইটা পড়ে শুনাও।’

আমি বই হাতে নিলাম। পল্টু স্যার আধশোয়া হয়ে আছেন। গভীর অগ্রহ নিয়ে পরাবাস্তব গল্প শুনছেন। তাঁর চোখে শিশুর মুঝ্বতা।

বিড়ালটা নাদুস বন্দুস কিন্তু অঙ্ক। তার জগৎ ধূসর। তার চোখ
পিটিপিটি ফরে, কিন্তু সে দেখে না। তার সামনে দুধের খাটি।
খাটিতে দুধ নেই। ফিংখা ছিল, দুষ্ট বিড়াল দেখতে পায় নি।
কারণ সে অঙ্ক। প্রথম তার যখন চোখ ফুটল, তখন তার গা
বলল, ‘ডার্লিং, দেখ কি সুন্দর পৃথিবী!’ সে পৃথিবী দেখে
বিলক্ষ ইল, কি বৃক্ষিত তখন সে নিজে নিজে অঙ্ক হয়ে
গেল। যে চোখে দেখে না, সে কথা বেশি বলে। বিড়ালের মা
তাকে একটা আমীন মোহাইল সেট উপহার দিল। সেখানে
কোনো সিমফার্ড ছিল না।

সে সিমফার্ড কিনতে আমীনের সেলস সেন্টারে গেল।
সেলস সেন্টারের পরিচালক একজন ভর্ণণী। তার বয়স
উনিশ। তিনি বৃক্ষিক রাশির জাতুক। আজ তাড়াহড়া ফরে
এসেছেন বলে শাড়ি পরে আসতে পারেন নি। তার সুগঠিত
শন ভেরের আলোয় ঝলমল করছে। তার স্তনযুগল দেখেই
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অনন্ত্রাত্মা পুজায় ফুসুম দুটি।
...সৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথও তখন একটা সিমফার্ড কিনতে
এসেছিলেন। তার ইচ্ছা বিড়িন ভর্ণণীদের তিনি টেলিফোন
করে জানতে চাইবেন— “সখী, জলবাসা করে কয় ?”

পল্টু স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘এখানে রবীন্দ্রনাথ কোথেকে এলেন ?’
আমি বললাম, ‘পরাবাস্তব গল্পে সব কিছুই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ হাফপ্যান্ট পরে
বিড়ি ফুকতে ফুকতে চলে আসতে পারেন। নিউমার্কেট কাঁচা বাজার থেকে
রাতা মুরগি এবং হিন্দি শুটকি কিমে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে বলতে
পারেন, ওগো ম্ মুরগির সালুন কর। হিন্দলের ভর্তা কর। আর আমাকে
কাদের সিন্দিকীর সাহেবের গামছাটা দাও। পুরুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।’

‘কাদের সিন্দিকীর গামছা মানে ?’

‘পলিটিক্যাল গামছা, স্যার। টেকসই, সহজে রঙ যায় না।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘এসব কি বলছ ? তোমাকে বই পড়ে শুনাতে হবে
না। তুমি বাসায় চলে যাও ঘুমাও।’

‘আমি রাতে হাসপাতালেই থাকব।’

‘ঘুমাবে কোথায় ?’

‘ঘুমাব না। জেগে থাকব। কাল সারা রাত জেগেছিলাম, তার আগের
রাতও জেগেছিলাম।’

‘কেন ?’

‘বাবার উপদেশ। বাবা বলে গেছেন— মাসে তিন দিন তিন রাত ঘুমাবি না। এক পলকের জন্যেও চোখের পাতা এক করবি না।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘কেন ?’

আমি বললাম, ‘স্লীপ ডিপ্রাইভেশন হলে কিংবা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব হলে— অস্তুত অস্তুত ঘটনা ঘটে। আমার বাবা চাচ্ছিলেন যেন আমি এই সব ঘটনা দেখি।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘তাহলে আমিও তোমার মতো জেগে থাকব।’

‘সেটা খারাপ না। জাগরণে যায় বিভাবৱী।’

পল্টু স্যার জেগে থাকার চেষ্টা প্রাণপণ করলেন বলেই মুহূর্তেই ঘুমিয়ে গেলেন। আমি জেগে রইলাম। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে; আমি বলি— এই চোখবাবারা জেগে থাকো। তোমরা দু'জনই ভাল। দু'জনই লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা।

স্লীপ ডিপ্রাইভেশন এক ধরনের ঘোর তৈরি করে। বাস্তব জগৎ বিড়ালের সীমকার্ড খাওয়ার জগৎ হয়ে যায়। রিয়েলিটির সংশয় তৈরি হয়। যেমন শেষ রাতে আমার কাছে মনে হল কেবিনে একটা অঙ্ক বিড়াল চুকেছে। সে ছেটাছুটি করতে গিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে এবং মিউমিউ করছে। কয়েকবার ঘনঘন চোখের পলক ফেলার পর বিড়াল অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে সমস্যার সমাধান হল না। তখন দেখলাম খাটে মাজেদা খালা শুরে আছেন। পল্টু স্যার না।

আমি বললাম, ‘খালা, তুমি এখানে কেন ?’

খালা বললেন, ‘তাতে তোর কোনো সমস্যা ? আমি কি করব না করব তা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।’

‘তুমি তাহলে তোমার প্রভু ?’

‘হেঁয়ালি কথা বল করবি ?’

‘অঙ্ক বিড়ালটা দেখেছ, খালা ?’

‘নাতো।’

‘তোমার মোবাইলটা সাবধানে রাখ। বিড়াল অঙ্ক হলেও দুষ্ট আছে। মোবাইল খুলে তোমার সিমকার্ড খেয়ে ফেলবে।’

‘কি সর্বনাশ! আগে বলবি না! দুনিয়ার নান্দার আমার এই সিমকার্ডে। এটা খেয়ে ফেললে আমার গতি কি হবে ?’

স্লীপ ডিপ্রাইভেশনে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। তোরবেলা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। বাটি ভর্তি গরম দুধ নিয়ে বসেছেন। পাউরুটি দুধে চুবিয়ে চুবিয়ে থাচ্ছেন।

আমি বললাম, ‘কি খাচ্ছ বাবা ?’

বাবা বললেন, ‘পাউরুটি খাচ্ছি। শরীরটা গেছে। সহজপাত্য খাবার হাড়া
কিছু খেতে পারি না। অস্থল হয়।’

‘চোখ এ রকম পিটাপিট করছ কেন ? চোখে কি কোনো সমস্যা ?’

‘চোখে দেখি না।’

‘কবে থেকে দেখ না ?’

‘দিন তারিখ ডায়েরিতে নোট করে রাখি নাই।’

‘খুব সমস্যা হচ্ছে ?’

‘না, খুব আরাম হচ্ছে। গাধা ছেলে।’

‘পরকালে মানুষ অঙ্ক হয় এটা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল
পরকালে সবার চির ঘোবন এবং...’

‘চুপ কর। কট কট করে কথা বলবি না। শান্তিমতো নাস্তা খেতে দে।
খাটের উপর শুয়ে আছে এই বুড়ো কে ?’

‘তুমিতো চোখে দেখ না। বুঝালে কি করে খাটে এক বুড়ো শুয়ে
আছে ?’

‘অনুমানে বুঝেছি। এই বুড়োর সমস্যা কি ?’

‘উনার সমস্যা কিডনী। দু’টা কিডনী। দু’টাই অচল। আচ্ছা বাবা ভাল
কথা এইসব ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের ভূমিকা কি হবে ? মহাপুরুষ কি তৎক্ষণাত
নিজেরটা দিয়ে দেবেন ?’

‘না।’

‘না কেন ?’

‘মহাপুরুষদের জীবনের মূল্য অল্পেক বেশি। তাদেরকে বেঁচে থাকতে
হবে। ভাল খাওয়া-দাওয়া, শান্তির নিদ্রা তাদের প্রয়োজন।’

‘বাবা, তুমিতো একেক সময় একেক কথা বল।’

বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘ঠিকই ধরেছিস। অঙ্ক হবার পর থেকে
কথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। যাই হোক, তুই শান্তিতে দুমো।
তিনবার বল ‘ঘূম শান্তি, ঘূম শান্তি, ঘূম শান্তি’ আরামের ঘূম হবে।’

আমি তিনবার ‘ঘূম শান্তি’ বললাম। সারাজীবন শনেছি ‘ওম শান্তি’ এখন
শনছি ‘ঘূম শান্তি’। সমস্যা নেই, আমার ঘূম দিয়ে কথা। লাশকাটা ঘরের
শান্তিময় জীবনানন্দ স্টাইলের নিদ্রা।

আমার ঘূম ভাঙল এক বুড়োর কথাবার্তায়। পল্টু স্যারের সঙ্গে এই বুড়ো
হংসিতম্বির ভঙ্গিতে কথা বলছে। গলা মিষ্টি। বিশেষ ভঙ্গিতে কর্কশ করার চেষ্টা
চলছে। কর্কশ হচ্ছে না। যে কথা বলছে সে সংগীতশিল্পী হলে নাম করত।

‘মেঝেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে এ কে ? তোমার সার্টেন্ট ?’

‘কেয়ার টেকার। নাম হিমু।’

‘যে সার্টেন্ট তাকে সার্টেন্ট বলবে। কেয়ার টেকার আবার কি ?’

‘সার্টেন্ট শুনতে খারাপ লাগে।’

‘খারাপ লাগার কিছু নাই। যে যা তাকে তাই বলতে হবে। নয়ত এরা মাথায় উঠবে। এর নাম কি ?’

‘হিমালয়।’

‘বা বা নামের তো বিরাট বাহার। নয়টা বাজে, এখনো শুয়ে ঘুমাচ্ছে—
এই শোন, এই।’

আমি চোখ মেললাম। ঘুম আগেই ভেঙেছিল। এখন চোখ পিটপিট
করছি। বুড়োকে দেখছি। সৌম্য চেহারা। দাঢ়ি আছে। পরেছেন নীল রঙের
আচ্ছান। হাতে বাহারী ছড়ি থাকার কারণে— নাটকের স্ম্যাট শাহজাহানের
মত লাগছে।

অদ্রলোক বললেন, ‘তোকে রাখা হয়েছে রুগ্নীর সেবা করার জন্য। আর
তুই হা করে ঘুমাচ্ছিস।’

আমি বললাম, সরি।

‘খবরদার, আর কোনোদিন সরি বলবি না। চাকর-বাকরের মুখে ‘সরি’
থ্যাংকযু এইসব মানায় না। আর শোন, তোকে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্গা এসব
ডাকতে পারব না। এখন থেকে তোর নাম আবদুল। বুঝেছিস ?’

‘বুঝেছি স্যার।’

‘আমি পল্টুর আপন চাচা।’

‘চাচা স্নামালিকুম।’

‘আমাকে চাচা ডাকবি না। তোর সঙ্গে আমার আঙীয়তা নাই। আমাকে
ডাকবি স্যার।’

‘ইয়েস স্যার।’

‘চিংকার করে ইয়েস স্যার বলবি না, তুই মিলিটারিতে চুক্স নাই।
বদপুলা।’

চাকরদের স্টাইলে অর্থহীন হাসি দিলাম। বাড়ির দামি কোনো কাচের
জিনিস ভাঙলে চাকর এবং বুয়ারা যে রকম হাসি দেয়। সেই হাসিতে লজ্জা
থাকে, অপ্রস্তুত ভাব থাকে। কঠিন হাসি।

বৃন্দ বললেন, ‘আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। রোগীকে তার বাসায় নামিয়ে
দিব। তুই হাসপাতালের অফিসে যা। রিলিজের বিষয়ে কি করতে হবে
খোজ নে।’

আমি ঘর থেকে বের হতে হতে শুনলাম পল্টু স্যার বললেন, ‘চাচা, তুই
তুই করে বলছেন কেন ?’

বুড়ো খেকিয়ে উঠে বলল, ‘তুই করব নাতো কি আপনি আপনি করে
কোলে বসাব ? পল্টু শোন, ছোট জাতকে ছোট জাতের মতো রাখতে হয়।
আদর দিলে লাফ দিয়ে মাথায় উঠে। মাথায় উঠেই ক্ষ্যাতি হয় না। মাথায়
“হেগে” দেয় !’

‘মাথায় হেগে দিবে কেন ?’

‘তাদের স্বভাব ‘হাগা’ এই জন্যে হাগবে !’

জটিল এই বৃক্ষ সম্পর্কে পরের কয়েক দিন যা জানলাম তা হচ্ছে—

এই বৃক্ষের নাম আবদুস সাত্তার। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। টিকাটুলিতে
তার চেম্বার। চেম্বারের নাম শেফা ক্লিনিক। নিচে লেখা ধনস্তরি হোমিও
চিকিৎসক, এ সাত্তার MC. MR. PL (ডাবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)।

ধনস্তরি বানান ভুল। MC. MR. PL এ কি হয় তা জানা যায় নি। আমি
উনার ক্লিনিকে গিয়ে জিজেস করেছিলাম। উনি চশমার ফাঁক দিয়ে
অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘তুই চাকর, তুই থাকবি চাকরের মতো
তুই MC র বুঝবি কি ? আর তুই এখানে এসেছিস কেন ? আমার চেম্বারে
তোর দরকার কি ?’

‘স্যারের জন্যে ওষুধ নিতে এসেছি। উনার ঘূম কম হচ্ছে।
হোমিওপ্যাথিতে ঘুমের ওষুধ আছে ?’

‘গাধার মতো কথা বলবি না। এমন ওষুধ আছে, এক ফোটা খাওয়ায়
দিলে হাতি সাত দিন ঘুমাবে।’

‘আমি মুখ শুকনা করে বললাম, হাতিরা কি আপনার কাছ থেকে অযুধ
নেয় ?’

আব্দুস সাত্তার বেশ কিছুক্ষণ হতভস্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে
থেকে তাঁর এসিস্টেন্টকে বললেন, ‘এই গাধাটাকে কানে ধরে চেম্বার থেকে
বের করে দাও। আর কোনো দিন যদি দেখি এই বদটা আমার চেম্বারে ঘুরঘুর
করছে, তাহলে সবার চাকরি যাবে।’

আব্দুস সাত্তার সাহেবের সম্পর্কে আর যা জানলাম তা হল— তাঁর
একটাই ছেলে। ছেলের নাম সোহাগ। বয়স আঠারো-উনিশ, এলাকার
ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন। প্রতি বোর্ড বিশ টাকা বাজিতে সারাদিন ক্যারাম থেলে।
সন্ধ্যার পর বাজি জেতা টাকায় ফেনসিডিল খেয়ে বিম ধরে থাকে। তার

ফেনসি বন্ধুদের নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ছোটখাট ছিনতাই করে। ভদ্র ছিনতাই। যেমন— কোনো বৃক্ষ সন্ধ্যার পর রিকশা করে বাড়ি ফিরছে। তখন সোহাগ চেঁচিয়ে বলবে, ‘এই যে মুরুবী! আপনার কি যেন পড়ে গেছে।’ তখন রিকশা থামে। বৃক্ষ কি পড়ে গেছে দেখার জন্যে পেছনে তাকান। সোহাগ তখন একটা মানিব্যাগ হাতে এগিয়ে আসে। এবং অতি বিলয়ের সঙ্গে বলে, ‘মুরুবী! এই মানিব্যাগটা পড়েছে। এটা কি আপনার? ব্যাগ ভর্তি টাকা।’

বেশির ভাগ বৃক্ষরাই বলে, ‘হ্যাঁ বাবা, আমার। আল্লাহ তোমার ভাল করুক।’

‘মানিব্যাগে কত টাকা আছে বলতে পারেন?’

‘বাবা, গনা নাই।’

‘বুড়ামিয়া! দুই দিন পরে কবরে যাবেন— লোভ আছে ঘোল আনা। অন্যের ব্যাগ বলতেছেন নিজের।’

‘বাবা, ভুল হয়েছে। অঙ্ককারে বুঝি নাই। আমার মানিব্যাগ পকেটেই আছে।’

‘দেখি। পকেটের মানিব্যাগ দেখি।’

এর মধ্যে দলের বাকিরা এসে রিকশা ঘিরে দাঁড়ায়। একজনের হাতে সুন্দর কাজ করা রাজস্থানী ছুরি। এই ছুরির বিশেষত্ব হচ্ছে এমিতে দেখলে মনে হবে লতা ফুল আঁকা ছয় ইঞ্চি ধাতুর ক্ষেত্র। বোতাম টিপলেই খটাস শব্দে ছুরি বের হয়ে আসে। ছুরির মাথা বকের ঠোঁটের মতো সামান্য বাঁকা।

বৃক্ষ খটাস শব্দে ছুরি বের হওয়া দেখে। ততক্ষণে তার আকেল গুরুম হয়ে গেছে।

‘মুরুবী মানিব্যাগটা দিয়ে কানে ধরে বসে থাকেন। মিথ্যা বলার শান্তি। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য রাখব। কান থেকে হাত সরালেই এই ছুরি পেটে হান্দায়া দেব।’

বিশেষ একটা জায়গা (জিয়ার মাজারের দক্ষিণ পাশে অনেককেই কানে ধরে যেতে দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালিটির লোকজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে— এই জায়গায় স্ট্রিট লাইট সব সময় নষ্ট থাকে।)

এত কিছু জানলাম কিভাবে? একটু পরে বলি? আগে তরুণী মেয়েদের কাছ থেকে গয়না এবং ব্যাগ কিভাবে নেয়া হয় এটা বলি। মনে করা যাক কোনো এক তরুণী রিকশা করে যাচ্ছে। জায়গাটা অঙ্ককার দেখে তরুণী খানিকটা ভীত। হঠাৎ সে দেখবে এক যুবক (সোহাগ) এগিয়ে আসছে এবং ব্যাকুল গলায় বলছে, ‘আপু, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। প্রীজ আপু! প্রীজ!’ মেয়ে

কিছু বলার আগেই রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে দেয়। সোহাগ এগিয়ে আসে। হাত কচলাতে কচলাতে বলে, ‘বন্ধুর সঙ্গে একটা বাজি ধরেছি। বাজি জিতলে এক হাজার টাকা পাই। আপা, আপনার পায়ে ধরি— help me.’

তরুণী তখন বলে, ‘কি বাজি?’

‘আপনাকে চুম্ব খাব, আপনি কিছুই বলবেন না। এই বাজি। আপু, আমি দাঁত ক্লোজআপ টুথপেস্ট দিয়ে মেজে এসেছি— কোনো সমস্যা নেই।’

রিকশাওয়ালা ভাই, তুমি অন্য দিকে তাকাও। তুমি থাকায় আপু লজ্জা পাচ্ছে। আপু এই যে দেখুন আমার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে বাজির ফলাফল দেখার জন্য। ওদেরকে বলে দিয়েছি যেন মোবাইল দিয়ে ছবি না তুলে। কেউ যদি ছবি তুলে তাহলে ভুঁড়ির মধ্যে ছুরি চুকায়ে দিব। এই দেখেন ছুরি।’ খটশ শব্দ হয়। ফলার ডেতর থেকে রাজস্থানী ছুরি বের হয়ে আসে।

চুম্বুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তরুণী সঙ্গে যা আছে সবই দিয়ে দেয়। হাত ব্যাগ, ঘড়ি, গলায় চেইন, ইমিটেশন গয়না। কিছুই নিজের কাছে রাখে না। ছিনতাই দলের প্রধান তখন অতি ভদ্র ভঙ্গিতে বলে— ‘সব কেন দিয়ে দেবেন আপা! রিকশা ভাড়া দিতে হবে না? বিশটা টাকা রাখুন, আপু। এই রিকশাওয়ালা! আপুকে সাবধানে নিয়ে যাও। অঙ্ককার জায়গা এভয়েড করবে। দিনকাল খারাপ।’

ঘটনা যা বললাম সবই পত্রিকায় প্রকাশিত। ছিনতাইকারি দলের প্রধান ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন সোহাগ যে পল্টু স্যারের আপন চাচাতো ভাই সেটা কি ভাবে জানলাম বলি—

হাসপাতাল থেকে ফেরার দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যায় পল্টু স্যার অশ্বির হয়ে পড়লেন, নতুন বই কিনবেন। ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, ‘গাড়ি বের কর।’

ড্রাইভার বলল, ‘স্যার, গাড়িতো বসে গেছে।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘গাড়ি বসে গেছে মানে কি? গাড়িতো বসেই থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে না।’

‘ব্যাটারি বসে গেছে, স্যার। নতুন ব্যাটারি কিনতে হবে।’

‘দুই মাস আগে না ব্যাটারি কিনলে?’

‘ব্যাটারী হল লাকের ব্যাপার। কোনো ব্যাটারি দুই দিনেই শেষ হয় আবার কোনোটা দুই বছর চলে। ঠিক না হিমু ভাই?’

বলেই ড্রাইভার আমাকে চোখ টিপ দিল। বাধ্য হয়ে আমাকেও চোখ টিপ দিয়ে টিপ ফেরত দিতে হল।

সে আমার সঙ্গে আভারট্যাক্টিং-এ যেতে চাছে। কাজের লোক, বুয়া, মালী, ড্রাইভার, দারোয়ান এদের রসুলের বৌঠা হয়ে থাকাই নিয়ম। একজনের অপরাধ সবার অপরাধ।

ড্রাইভার বলল, ‘পাঁচ হাজার টাকা দেন স্যার, নতুন ব্যাটারি নিয়ে আসি। তবে আজ গাড়ি বের করতে পারবেন না।’

পল্টু স্যার ড্রাইভারকে ব্যাটারির টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে বই কিনতে বের হলেন। আমরা রিকশা করে যাচ্ছি— যথাসময়ে এবং যথাজায়গায় একজন টাকা ভর্তি মানিব্যাগ নিয়ে ছুটে এল এবং চেঁচাতে লাগলো ‘মুরুক্কী, এই মানিব্যাগ কি আপনার ?’ পল্টু স্যার বললেন, ‘কে সোহাগ না ? কেমন আছ ?’

যুবক চোখ মুখ কুঁচকে ফেলে বলল, ‘ভাল আছি পল্টু ভাইজান।’

পল্টু স্যার বলল, ‘এই মানিব্যাগ আমার না ! আমারটা পকেটেই আছে। মনে হয় অন্য কারোর।’

আমি বললাম, ‘ভাই, মানিব্যাগটা আমার। পকেট থেকে পড়ে গেছে খেয়াল করি নাই।’

সোহাগের বন্ধুরা এগিয়ে আসছিল। সোহাগের ইশারায় তারা পিছনে সরে গেল।

সোহাগ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনার যে মানিব্যাগ তার প্রমাণ কি ? এখানে কত টাকা আছে বলতে পারবেন ?’

আমি বললাম, ‘এখানে আছে উনিশশ’ দশ টাকা। ভাই, আপনি গুনে দেখেন।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘দেখি, আমি গুনে দেই। টাকা গুনতে আমার ভাল লাগে। বইয়ের পাতা উল্টাতে যেমন ভাল লাগে, টাকা গুনতেও ভাল লাগে। টাকা গুনার সময় মনে হয় বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি।’

টাকা গুনে দেখা গেল উনিশশ দশ টাকাই আছে। কাকতালীয় ব্যাপার ছাড়া কিছুই না। সবার জীবনেই কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। আমার বেলায় একটু বেশি বেশি ঘটে।

সোহাগকে হতভন্ন অবস্থায় রেখে আমরা চলে এলাম। পল্টু স্যার বললেন, ‘আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এই ছেলের পাওয়ার কথা। আমার কোনো ওয়ারিশ নাই।’

আমি বললাম, ‘স্যার, আপনার কি অনেক টাকা-পয়সা ?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘হ্যাঁ।’

আমি বললাম, ‘এত টাকা কিভাবে করেছেন ?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমি করব কিভাবে ? আমার বাবা করেছেন। ব্যবসা করতেন। কিসের ব্যবসা কিছুই জানি না। তাঁর কথা ছিল যেদিন বিশ কোটি টাকার সম্পদ হবে সেদিন তিনি তওবা করে টাকা রোজগার বন্দ করবেন।’

‘তওবা করার সুযোগ কি পেয়েছিলেন স্যার ?’

‘না। যেদিন তওবা করার কথা ছিল সেদিন সকাল বেলায় নাস্তা খাবার সময় মাংসের টুকরা গলায় আটকে গেল। আমি তখন তাঁর সামনে বসে নাস্তা খাচ্ছিলাম। আমি বুঝতেই পারি নাই বাবা মারা যাচ্ছেন। আমি ভাবছি বাবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? তারপরেই—‘ধূম !’

‘ধূম কি ?’

‘ধূম করে উনার মাথাটা টেবিলে পড়ে গেল। তুমি আবার ভেবো না মাথা খুলে টেবিলে পড়ে গেছে। উনাকে সহ-ই পড়েছে। মাথা টেবিলে দেগে ধূম শব্দ হয়েছে।’

‘ও আচ্ছা।’

পল্টু স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—‘ধূম বলা ঠিক হয় নাই। বলা উচিত ধূম বানবান। ধূম করে মাথাটা টেবিলে লাগল। টেবিলে পানির যে গ্লাস ছিল সেটা মেঝেতে পরে ভেঙে শব্দ হল বানবান। কাজেই ধূম বানবান।’

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। বাবার মৃত্যু যে কারো কাছে ধূম বানবান হতে পারে তা আমার ধারণাতে নেই। একজন সর্ববিষয়ে নির্বিকার মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে। উনি কি মহাপুরুষদের মতো চরম নিরাসকদের একজন। মহাপুরুষ সম্পর্কে আমার বাবার ধ্যান-ধারণা এ রকমই। মহাপুরুষদের নানান লক্ষণ বলতে গিয়ে তিনি বলছেন—

আসক্তি

চরম আসক্তির অন্য নাম নিরাসকি। মহাপুরুষরা সর্ববিষয়ে যে নিরাসকি দেখাইয়া থাকেন তাহা চরম আসক্তিরই অন্য পরিচয়। তোমাকে উদাহরণ দিয়া বুঝাই— মনে কর এক লোকের মদ্যপানের কিছু নেশা আছে। সেই ব্যক্তি মাঝে মধ্যে কিছু মদ্যপান করিবে।

তাহার জন্যে নানান আয়োজন করিবে। মদ্যপানের সময় চাটের ব্যবস্থা, সংগীত শ্রবণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই লোকই যখন মদ্যপানে চরম আসক্তি দেখাইবে তখন সে শুড়িখানায় উপস্থিত হইবে— তখন তাহার চাটের প্রয়োজন নাই, সংগীতেরও প্রয়োজন নাই। মদ্য হইলেই হইল। এই আসক্তি আরো বাড়িলে মদ্য পানেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। নেশার বস্তু থাকিবে কিন্তু নেশা থাকিবে না।

একগাদা বই কিনে বাসায় ফিরে দেখি ড্রাইভারের ঘরের সামনের বেঞ্চিতে সোহাগ বসে আছে। হাতে সিগারেট।

পল্টু স্যারকে দেখে সে সিগারেট লুকানোর চেষ্টা করল। স্যার তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। হাত ভর্তি বই নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। এক্ষুণি তাকে বই পড়া শুরু করতে হবে। খেজুরে আলাপের সময় নেই।

ড্রাইভার চাপা গলায় ডাকল, ‘হিমু ভাই, শুনে যান। আপনার সঙ্গে কথা আছে। সোহাগ ভাইজান কি জানি বলবে। আপনি উনারে চিনেনতো?’

আমি বললাম, ‘দেখা হয়েছে। ওস্তাদ মানুষ।’

সোহাগ সিগারেট ছুড়ে ফেলে বলল, ‘যে দেখা হয়েছে, সেই দেখা কোনো দেখাই না। তোমার সঙ্গে আসল দেখা বাকি আছে।’

আমি বললাম, ‘আসল দেখা কখন হবে? রোজ হাশরের ময়দানে?’

‘রোজ হাশর আমি তোমারে দেখাবে দিব। মানিব্যাগ আন।’

‘মানিব্যাগতো জমা দিয়ে দিয়েছি।’

‘কোথায় জমা দিয়েছি।’

‘ধানমন্ডি থানার ওসি সাহেবের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছি। উনি যেন আসল মালিককে ফিরত দেন।’

‘আমাকে ধানমন্ডি থানা চিনাও? চল আমার সঙ্গে থানায়। ব্যাগ রিলিজ করে নিয়ে আস।’

ড্রাইভার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ‘মানিব্যাগ দিয়ে দেন হিমু ভাই। এই লোক কিন্তু ডেনজার।’

আমি সোহাগের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘ভাইজান, আপনি না-কি ডেনজার?’

সোহাগ বেঞ্চিতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘প্রমাণ চাস? তুই প্রমাণ চাস (সে যে ডেনজার এটা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় তুই তুই

করে বলছে। তবে একটা হাত পকেটে ঢুকেছে। মনে হচ্ছে রাজস্থানী বস্তু
বের হবে।)

‘কি, কথা বলস না কেন, প্রমাণ চাস?’

আমি বললাম, ‘প্রমাণ সবাই চায়। পাকিস্তানী মিলিটারী প্রমাণ চেয়েছে।
হিন্দু না মুসলমান এই প্রমাণ। অনেককেই লুঙ্গি খুলে ঘন্টপাতি দেখাতে
হয়েছে।’

ড্রাইভার ভীত গলায় বলল, ‘ভাইজান, এইখানে কিছু করবেন না; যা
করার বাইরে নিয়া করেন।’

সোহাগ রাজস্থানী ছুড়ির বোতাম টিপে যাচ্ছে— জিনিস বের হচ্ছে না।
আমি বললাম, ‘নষ্ট হয়ে গেছে না-কি?’

সোহাগ আগুন চোখে তাকাল। আমি বললাম, ‘নষ্ট জিনিস পকেটে রাখা
ঠিক না। তারপর আবার করেছেন টিপাটিপি। এই জিনিস পকেটে রাখবেন,
হঠাতে আপনা আপনি খুলে যাবে— পুট করে আপনার বিচি একটা খুলে পড়ে
যাবে। তখন সবাই আপনাকে ডাকবে এক বিচির সোহাগ।’

ড্রাইভার মহাচিত্তিত গলায় বলল, ‘হিমু ভাই, এইসব কি বলেন? আপনি
কারে কি বলতেছেন নিজেও জানেন না।’

সোহাগ বলল, ‘জানবে। চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে জানবে। যদি না জানে
আমি পিতা-মাতার সন্তান না। আমি জারজ সন্তান।’

ড্রাইভার সোহাগের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে ঝামেলা চায় না।
গাড়ির তেল, ব্যাটারি, টায়ার এসব মাঝে মাঝে ছুরি করে সে জীবনটা পার
করে দিতে চায়।

ঘরে ঢুকে দেখি পল্টু স্যার বই নিয়ে বসে গেছেন। তাঁর মুখ প্রশান্ত। যে
লেখক এই বইটি লিখেছেন তিনি দৃশ্যটা দেখলে আরাম পেতেন। অবশ্যই
তাঁর কাছে মনে হতো তাঁর লেখক জীবন স্বার্থক।

‘স্যার, চা বা কফি কিছু লাগবে?’

‘না।’

‘লেবুর সরবত করে দেব? ক্লান্তি দূর হবে।’

‘তাহলে করে দাও।’

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি লেবু নেই। আমি স্যারকে বললাম, ‘স্যার, ঘরে
লেবু নেই। লেবু ছাড়া লেবুর সরবত করে দেব?’

‘দাও। লেবুর সরবত দিয়ে চেষ্টা করতে থাক লকারটা খুলতে পার কি-
না। রিং ঘুরাতে থাক। এক সময় না এক সময় খুলবেই। সাতটা মাত্র
সংখ্যা। আমার ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু লকারে আছে। কী আছে
মনে করতে পারছি না।’

আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি। শুরু করেছি ০ দিয়ে—

০০০০০০

০০০০০০১

০০০০০১১

০০০০১১১

এতো দেখি ভয়াবহ ব্যাপার। মোট কতবার ঘুরালে একবার না একবার
বিশেষ সংখ্যাটা চলে আসবে তাই বা কে জানে।

বাদলকে জিজ্ঞেস করলে পাওয়া যাবে। অঙ্ক তার কাছে ছেলেখেলা।

আমি রিং ঘুরিয়েই যাচ্ছি।



ରାନୁ ଟାକା ନିଯେ ଏମେହେ । ସବଟା ଆନତେ ପାରେନି, ଏକ ହାଜାର ତିନିଶ ଟାକା ଏମେହେ । ଟାକାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକେର ଦୁଟା ଅହିସତ୍ରୀମେର ବାଟି । ଏକଟା ବାଟିତେ ମୋରଗ-ପୋଲାଓ, ଅନ୍ୟ ବାଟିତେ ଫିରନୀ । ଦୁଟାଇ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧା କରେଛେ । ଆମାର ଧାରଣା ଏହି ଦିନେର ଖାବାରଟା ଫେରତ ଦିତେ ଚାହେ । ମନେ ହଛେ ଏହି ମେଯେ ଝନ ରେଖେ ମରେ ଯାଓଯା ଟାଇପ ନା ।

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆପନି ଏହି ବାଡ଼ିର କେ ବଲୁନତୋ । ଆମି ଦାରୋଯାନକେ ବଲଲାମ, “ହିୟୁ ସାହେବେର ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ଯାବ ।” ଦାରୋଯାନ ଚେନେ ନା ।’

‘ଆମି ଏହି ବାଡ଼ିର ଚାକର । ଅନ୍ତରେ ଭାବା ଗୃହଭୂତ୍ୟ । “ବାବୁ କହିଲେନ, ବୁଝେଇ ଉପେନ ଟାଇପ ।” ଆମାକେ ଚେନାର କଥା ନା । ଚାକରେର ପରିଚୟେ ଫ୍ଲ୍ୟାଟେର ପରିଚୟ ନା ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆପନି କେନ ସବ ସମୟ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଏହି ଭାବେ କଥା ବଲେନ ? ଏ ଯେ ବୁଡ଼ୋ ମାନୁସଟା ଇଞ୍ଜିଚେଯାରେ ବସେ ବହି ପଡ଼ିଲେ, ତିନି ଆପନାର କେ ହନ ?’

‘ମୁନିବ ହନ । ଉନି ମୁନିବ, ଆମି ଭୃତ୍ୟ ।’

‘ଅସଭ୍ବବ । ଉନି ଆପନାର ବାବା । ଆମି ଚେହାରା ଦେଖେଇ ବୁଝେଇ ।’

କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଘାଡ଼ ଘୁରିଯେ ତାକାଲେନ । ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଭଞ୍ଜିତେ ବଲଲେନ, ‘ହିୟୁ, ବାବୁଇ ପାଖି ତାଲଗାଛ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ବାସା ବାଁଧେ ନା ?’

‘ଜୁ ନା, ସ୍ୟାର ।’

‘ଯଦି ସବ ତାଲଗାଛ କେଟେ ଫେଲା ହୁଏ, ତଥନ ଓରା କୋଥାଯ ବାସା ବାଁଧବେ ?’

‘ଓରା ଏକଟା ସମସ୍ୟା ତୋ ପଡ଼ିବେଇ । ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଗାଛେ ଟ୍ରାଇ କରବେ ।’

‘କୋନ ଗାଛ ?’

‘ଆମାର ଧାରଣା, ସୁପାରି ଗାଛେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା କରବେ ।’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଚିନ୍ତିତ ଭଞ୍ଜିତେ ବଲଲେନ, ‘ଜିନିସଟା ଅନ୍ତୁତ ନା ? ବାବୁଇ ପାଖିଦେର ତାଲଗାଛେଇ ବାସା ବାଁଧିବେ ହବେ ? ଗଭୀର କୋନୋ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ ।’

‘ଚିନ୍ତାର ବିଷୟତୋ ଆଛେ ।’

‘ঐ মেয়ে কে ?’

‘স্যার, আমাদের বাবুচি ।’

পল্টু স্যার খুবই অবাক হয়ে বললেন, ‘আমাদের রাবুচি আছে, জানতাম নাতো! নিজেদের বাবুচি আছে, অথচ আমরা হোটেল থেকে খাবার এনে খাচ্ছি কেন ?’

আমি বললাম, ‘আজই এপ্রেন্টিশিপ দেয়া হয়েছে। সে তার রান্নার স্যাম্পলও নিয়ে এসেছে। দুপুরে আপনাকে খেতে দেব। মোরগ-পোলাও আর ফিরনী। খেয়ে যদি আপনার পছন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পারমাণেন্ট।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘এক বেলার রান্না খেয়ে তার রন্ধনশৈলী বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।’

আমি বললাম, ‘তাহলে এক সপ্তাহ রাঁধুক এক সপ্তাহ পরে বিবেচনা করা হবে।’

‘মেয়েটার নাম কি ?’

‘স্যার, আপনিই জিজ্ঞেস করুন।’

আমি রান্নার দিকে তাকালাম। সে আমাদের কথাবার্তায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অতি বুদ্ধিমতীরাও বিভ্রান্ত হবে। পল্টু স্যার হাতের বই বন্ধ করে চোখের চশমা ঠিক করলেন। চশমা ঠিক করা মানে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা। পল্টু স্যার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এই কাজটা করেন।

‘নাম কি বল ?’

‘রানু।’

‘রানু কোথায় শিখেছ ?’

‘মা’র কাছে শিখেছি।’

‘মনে কর তুমি কৈ মাছের ঘোল রান্না করছ। সাধারণ লবণ দিয়ে রান্না করলে যে স্বাদ হবে, বিট লবণ দিয়ে রান্না করলেও কি একই স্বাদ হবে ?’

‘বিট লবণ দিয়ে যে মাছের ঘোল রান্না করা যায় এটাই আমি জানি না।’

‘কোন রান্নাটা তুমি ভাল পার ?’

‘ইলিশ মাছের ডিমের ঘোল।’

পল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হিমু, চট করে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসো। আমারো হঠাতে করে কেন জানি ইলিশ মাছের ডিমের ঘোল খেতে ইচ্ছা করছে। বাবুচির চাকরি পার্মাণেন্ট হবে কি-না তা ইলিশ মাছের ডিম রান্নার উপর নির্ভর করবে।’

ରାନୁର ହତଭ୍ରମ ଭାବ କ୍ରମେଇ ବାଡ଼ିଛେ । ଏକ ସମୟ ସେ ଗା ବାଡ଼ା ଦିଯେ ଉଠିଲ । କଠିନ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ଏକଟା ଭୁଲ ହଛେ । ଆମି ବାବୁଚିର କାଜେର ଜନ୍ୟ ଏ ବାଡ଼ିତେ ଆସି ନି । ଆମାକେ ଏସବ କେନ ବଲଛେ ? ଆମାକେ ଦେଖେ କି ବାବୁଚିର ମତୋ ଲାଗଛେ ?’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଆମାର ଦିକେ ସାହାଯ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ତାକାଲେନ । ରାନୁର କଥାଯ ତିନିଓ ଖାନିକଟା ହକଚକିଯେ ଗେଲେନ । ଆମି ବଲଲାମ, ‘ରାନୁ ଶୋନ, ଆଯା ବା ବାବୁଚି ଏରା ଦେଖିତେ ଆଲାଦା ହ୍ୟ ନା । ଏଦେର କୋନୋ ଆଲାଦା ପୋଶାକଓ ନେଇ । ଏବଂ ସତି କଥା ବଲତେ କି ତୋମାର ଭାବଭଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟେ କିଛୁ ବାବୁଚି ଭାବ ଅବଶ୍ୟକ ଆଛେ ।’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଭରସା ପେଯେ ବଲଲେନ, ‘ଅବଶ୍ୟକ ଅବଶ୍ୟକ । ଖୁବଇ ସତି କଥା । କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝା ଟାଇପ । ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ଭାବ ।’

ଆମି ବଲଲାମ, ‘ତାରପରେଓ ତୋମାକେ ବାବୁଚିର ଚାକରି ଅଫାର କରାଯ ତୋମାର ସଦି ସମ୍ମାନ ହାନି ହ୍ୟେ ଥାକେ, ତାହଲେ ଆମି ଏବଂ ସ୍ୟାର ଆମରା ଦୁ’ଜନଇ ଦୁଃଖିତ ।’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, ‘ହଁଏ ଦୁଃଖିତ । ତବେ ବାବୁଚିର କାଜେର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ଅସମ୍ମାନ ନେଇ । ପୃଥିବୀର ଅନେକ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବୁଚି ଛିଲେନ ଯେମନ ଏରିଷ୍ଟଟଳ, ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦ୍ୟା ଭିଙ୍ଗି ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ତୁମାରା ବାବୁଚି ଛିଲେନ ?’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, ‘ଅବଶ୍ୟକ । ନିଜେରା ନିଜେଦେର ଥାବାର ରାନ୍ଧା କରେ ଖେତେନ । ଏଥନ ତୁମି ବଲ, ବେତନ କତ ଚାଓ ?’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ବେତନ କତ ଚାଇ ମାନେ କି ?’

‘ତୁମି ନିଶ୍ଚରି ବେତନ ଛାଡ଼ା କାଜ କରବେ ନା । ଆର ଆମାର ପକ୍ଷେଓ ଆକାଶ-ପାତାଳ ବେତନ ଦିଯେ ବାବୁଚି ରାଖା ସଭବ ନା । ଲକାର ଖୋଲା ଯାଚେ ନା ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆମରା ଏକଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଘୁରାଫିରି କରାଇ । ହ୍ୟ ଆପଣି କନ୍ଫିଡ଼ଜଡ ନୟତ ଆମି କନ୍ଫିଡ଼ଜଡ । ଆମି ଏଥନ ଚଲେ ଯାଇଁ, କିଛୁ ମନେ କରବେନ ନା । ଲ୍ଲାମାଲିକ୍ରମ ।’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ସାଲାମେର ଜବାବ ନା ଦିଯେ ବହିଯେ ମନ ଦିଲେନ । ପାତା ଉଲ୍ଟେ ବହିଯେର ଦିକେ ଝୁଁକେ ଏଲେନ । ତାର ଚୋଥ ଚକଚକ କରତେ ଲାଗଲ । ରାନୁ ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲ, ‘ଆମି କି ଆପଣାର ସଙ୍ଗେ ଆଲାଦା ଏକ ମିନିଟ କଥା ବଲତେ ପାରି ? ଆଡ଼ାଲେ ?’

ଆମି ବଲଲାମ, ‘ଆଡ଼ାଲେ ଯାବାର ଦରକାର ନେଇ । ଏଖାନେଇ କଥା ବଲତେ ପାର । ସ୍ୟାର ବହି ପଡ଼ା ଶୁରୁ କରେଛେନ, ଏଥନ କୋନୋ କିଛୁଇ ତାର ମାଥାଯ ଚୁକବେ ନା । ତାକେ “ଏହି ଛାଗଲା, ବହି ପାଗଲା” ବଲେ ଗାଲିଓ ଦିତେ ପାର । ତିନି କିଛୁଇ ବୁଝବେନ ନା ।’

ରାନୁ କଠିନ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ଆପଣି ଦୟା କରେ ଅନ୍ୟ ସରେ ଆସୁନ! ପ୍ରିଜ!’

ଆମି ରାନୁକେ ନିଯେ ରାନ୍ଧାଘରେ ଗେଲାମ । ଏହି ବାଡ଼ିତେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ରାନ୍ଧାଘରେଇ ଦୁଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକେର ଟୁଲ ଆଛେ । ପିନ୍ଡିର ଆଧୁନିକ ସଂକରଣ । ରାନୁକେ ବସତେ ବଲଲାମ, ସେ ବସଲ ନା । ଥମଥମେ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ଆପଣି କି ସତିଇ ଉନାର ସାରଭେଟ ? ଚାକର ବଲତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗଛେ ବଲେ ସାରଭେଟ ବଲଛି ।’

ଆମି ବଲଲାମ, ‘ସରାସରି ଚାକର ବଲତେ ପାର । ଲଜ୍ଜା ପାଓୟାର କିଛୁ ନେଇ । ଭୃତ୍ୟକେ ସ୍ଵର୍ଗ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଯେଛେ । ତାଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଇନ ଆଛେ—“ଆମି ତବ ମାଲକ୍ଷେର ହବ ମାଲକାର ।” ମାଲକାର ବ୍ୟାଟା ଚାକର ଛାଡ଼ା କିଛୁ ନା ।’

‘ହାଇ ଲେଭେଲେର କଥା ବନ୍ଦ କରେ ସରଲ କରେ ବଲୁନ ସଟନା କି ? ଆପଣି ଚାକର ହବେନ କେନ ?’

‘ଆମି ଏକଟା ଜରୁରି ମିଶନ ନିଯେ ଏଥାନେ କାଜ କରଛି ।’

‘କି ମିଶନ ?’

‘ପାନ୍ତୁ ସ୍ୟାର ବହୁ ଟାକାର ମାଲିକ । ବିଶ କୋଟି ଟାକାର ବେଶିତୋ ବଟେଇ । ଉନି ମାରା ଗେଲେଇ ସୋହାଗ ନାମେର ଏକଜନ ପୁରୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବେ । ଆମାର ମିଶନ ହଜ୍ଜେ ଉନି ଯାତେ ଦ୍ରୁତ ମାରା ଯାନ, ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରା ।’

‘ତାର ମାନେ ?’

‘ଭଦ୍ରଲୋକେର ସମୟ ସନିଯେଛେ । ଦୁଟା କିଡନୀଇ ନଷ୍ଟ । ଆମାକେ ଦେଖତେ ହବେ ତିନି ଯେନ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ଲାନ୍ଟେ ରାଜି ନା ହନ । ବୁଝାତେ ପାରଛ ?’

‘ନା ।’

ଆମି ଗଲା ନାମିଯେ ବଲଲାମ, ‘ଆମି ଏ ବାଡ଼ିତେ ଚୁକେଛି ତାଙ୍କେ କିଡନୀ ଦେବ ଏହି ଅଜୁହାତେ । ଏଥିନ ତାର ଧାରେ-କାହେ ଯାଛି ନା । ସ୍ୟାରେର ଶ୍ରୀର ଦ୍ରୁତ ଖାରାପ ହଜ୍ଜେ । ପରିକଳ୍ପନା ମତୋ ସବ ଏଣ୍ଜେ ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆପନାର କଥା ଯଦି ସତି ହୟ ତାହଲେ ଆମାକେ ଏହି ଗୋପନ କଥାଗୁଲୋ କେନ ବଲଛେନ ?’

‘ତୋମାକେ ବଲଛି, କାରଣ ତୁମିଓ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାର ଅଂଶ ।’

ରାନୁ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର କରେ ବଲଲ, ‘ଆମି କି କରେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାର ଅଂଶ ହବ ?’

‘ମାଜେଦା ଖାଲା ତୋମାକେ କିଡନୀ ଦେବାର ଜନ୍ୟେ ଫିଟ କରେଛେ । ଠିକ ବଲଛି ନା ?’

ରାନୁ ହତଭସ୍ତ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ସେଇ କିଡନୀ କି ଉନାର ଜନ୍ୟେ ?’

‘ଅବଶ୍ୟଇ । ତୋମାକେ କି କରତେ ହବେ ଶୋନ— ବୁଡ୍ଡୋଟାକେ ନାନାନ କଥାଯ ଭୁଲିଯେ ଭାଲିଯେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ଲାନ୍ଟଟା ଦେଇ କରାବେ । ଯେନ ଦ୍ରୁତ କର୍ମ କାବାର ହୟେ ଯାଇ । ଶୋହାଗ ଭାଇଜାନ ବଗଲ ବାଜାତେ ପାରେନ ।’

ରାନୁ ବଲଲ, 'ଆପଣି ଅତି ଭୟକର ମାନୁଷ । ଆମି ଆଗେଇ ଧାରଣା କରେଛିଲାମ । ଆମାର ଉଚିତ ସବ କିଛୁ ପୁଲିଶେ ଜାନାନୋ ।'

'ଭୁଲେଓ ଏହି କାଜ କରବେ ନା । ପୁଲିଶେ ଆମାଦେର କେନା । ସବଚେ ସହଜ ପଣ୍ଡ ହଲ ମାନୁଷ । ମାନୁଷ କେନା କୋନୋ ସମସ୍ୟାଇ ନା । ମାନୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ସହଜେ କେନା ଯାଇ ବୁନ୍ଦିଜୀବୀଦେର । ତୌରା ଖୁବ ଆଗ୍ରହ ନିଯେ ଅପେକ୍ଷା କରେନ କଥନ ବିକ୍ରି ହବେନ ।'

'ବକବକମିଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରବେନ ?'

'କରିଲାମ ।'

'ଆମି ଏଥିନ ଚଲେ ଯାବ । ତବେ ଭାବବେନ ନା ଆମି ସହଜ ମେଯେ । ଏକଟା ମାନୁଷକେ ଖୁନ କରବେନ ଆର ଆମି ସବ ଜେନେଓନେଓ ଚୁପ କରେ ଥାକବ ?'

'ଖୁନତୋ କରଛି ନା । ନେଚାରେ ଉପର ନିର୍ଭର କରାଇ । ନେଚାର ତାର କୋର୍ସେ ଚଲବେ । ସଥା ସମୟେ ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ବହି ପଡ଼ିତେ ପଡ଼ିତେ ପଟଳ ତୁଲବେନ । ଉନାର ଜନ୍ୟେଓ ଭାଲ । ବହି ପଡ଼ିତେ ପଡ଼ିତେ ଖୁବ କମ ମାନୁଷଙ୍କ ମାରା ଯାଇ । ଶୁଦ୍ଧ ଏକଜନକେ ପାଓଯା ଗେଛେ ଯିନି ବହି ପଡ଼ା ଶେଷ କରେ ଲାଇବ୍ରେରି ଥିକେ ଶିଡି ଦିଯେ ନାମାର ସମୟ ପା ପିଛଲେ ମାରା ଗେଛେନ । ମୋଘଲ ବାଦଶା ହମାଯୁନ ।'

ରାନୁ ବଲଲ, 'ଆପନାର ପ୍ରତିଟି କଥାଇ ଅସହ୍ୟ ଲାଗଛେ । ଆମି କି ଆରେକ ବାର ଉନାର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲିବେ ପାରି ?'

ଆମି ବଲିଲାମ, କି କଥା ବଲିବେ ?

'ଉନାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ ଜାନବ ଆପଣି ଯା ବଲଲେନ ସେଟା ସତି କି-ନା ।'

'କିଭାବେ ଜାନିବେ ? ସରାସରି ଜିଜ୍ଞେସ କରିବେ ? ଆମାକେ ଫାସାବେ ?'

'ଆପନାର ଭଯ ନେଇ, ସରାସରି କିଛୁ ଜିଜ୍ଞେସ କରିବ ନା । ଆମି ବୋକା ମେଯେ ନା ।'

ରାନୁକେ ଆବାର ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାରେର କାହେ ନିଯେ ଗେଲାମ । ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ବହି ଥିକେ ମୁଖ ତୁଲେ ଆନନ୍ଦିତ ଗଲାଯ ବଲଲେନ, 'ତୋମାର ବେତନ କତ ଠିକ ହେଁବେ ?'

ରାନୁ ବଲଲ, 'ସ୍ୟାର, ଆମିତୋ ଆଗେଇ ବଲେଛି, ଆମି ବାବୁର୍ଚିର କାଜ କରିବ ନା । ଆମି ଶୁଦ୍ଧ ଆପନାକେ ଏକଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏସେଛି ।'

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, 'ପ୍ରଶ୍ନେର ଜୀବାବ ଦିତେ ପାରିବ ନା । ଦେଖଇ ନା ବହି ପଡ଼ିଛି ?'

'ସ୍ୟାର ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିମୁ ନାମେର ଏହି ମାନୁଷଟା କି ଆପନାକେ କିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଂସପ୍ଲାନ୍ଟ କରିବେ ନିଷେଧ କରିଛେ ?'

'ହଁଥା କରିଛେ । ଏବଂ ତାର କଥା ଆମାର କାହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଲେ ମନେ ହଜେ । କେନ ଆମି ଅନ୍ୟ ଏକଜନେର ଶରୀରେର ଅଂଶ ନିଯେ ବୈଚି ଥାକବ ? ଯାର

কিডনী নিলাম, তার থাকবে একটা মাত্র কিডনী। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে বেচারার গতি কি হবে ?'

রানু বলল, 'স্যার, আমি যাই। স্নামালিকুম। একটাই অনুরোধ, আপনার কাজের লোকের কথায় আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'কেন ? আমিতো সোসাইটিতে কোনো কিছু Contribute করতে পারছি না। শুধু বই পড়ছি। আমার বেঁচে থাকা মানে দরিদ্র দেশের কিছু খাবার নষ্ট করা। বাতাস থেকে কিছু অক্সিজেন নিয়ে শ্রিন হাউস এফেস্টকে আগিয়ে নেয়া।'

'এসব যুক্তি কি আপনার ঐ লোক আপনাকে বুঝিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। তার যুক্তি খুবই ভাল। এখন তুমি যাও— বই পড়ছিতো! বই পড়ার সময় ফালতু কথাবার্তা খুবই অসহ্য লাগে।'

রানু বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যে দৃষ্টি সে আমাকে দিল ইংরেজিতে তাকে বলে Ash Look, বাংলায় ভস্ম দৃষ্টি। মুনী-ঝঁঝিদের টাইমে তারা এই দৃষ্টি দিয়ে দুষ্ট লোক ভস্ম বানিয়ে ফেলতেন। সেই ভস্ম গায়ে মেঝে সাধনায় বসতেন। ভস্ম নষ্ট হতো না। কাজে লাগতো।

রানু যাবার ঘণ্টা খানিকের মধ্যে বাদল এসে উপস্থিত। দরজা খুলতেই সে চুকল। কিছুক্ষণ পল্টু স্যারকে জুলজুল চোখে দেখল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'হিমুদা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কারো একজনের চেহারার মিল পাচ্ছি। কে বলতো !'

আমি বললাম, 'ফিসফিস করে কথা বলতে হবে না। উনি যখন পড়ায় ব্যস্ত থাকেন তখন বাড়ির ছাদে এটম বোমা ফাটলেও উনি ঠিক মতো শুনতে পান না। ভাবেন, বেলুন ফেটেছে। এই সিন্দ্রমের নাম পাঠ বধির সিন্দ্রম।

'কার চেহারার সঙ্গে মিল সেটা বল।'

'দু'জনের চেহারার সঙ্গে খুব মিল একজন হচ্ছে আরব্য রজনীর বুড়োটা। যে ঘাড়ে চেপে থাকে, ঘাড় থেকে নামে না।'

'ঠিক বলেছতো।'

'আবার উনি যখন বই পড়া বন্ধ করে মাথা তুলে তাকান তখন তাঁকে খানিকটা টেকো মাথা আইনষ্টাইনের মতো লাগে।'

বাদল বলল, 'হিমুদা, দু'দিন যদি তোমার সঙ্গে থাকি তাহলে কোনো সমস্যা আছে ? ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখাও হয় না। থাকব দু'দিন ?'

‘থাক।’

‘রাতে ঘুমাব কোথায় ?’

‘মেঝেতে ঘুমাবি। চাকর-বাকরের আঞ্চীয়-স্বজন এলে কোথায় ঘুমায় ?
মেঝেতে ঘুমায়। চাকরের আঞ্চীয় হিসেবে দু'দিন থাক— ভাল লাগতে
পারে।’

বাদল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, ‘ভেরি ইন্টারেক্ষিং আইডিয়া।
অন্দরোক কি পড়ছেন ?’

‘এখন একটা উপন্যাস পড়ছেন। দেড়শ পৃষ্ঠার উপন্যাস। আমি সেই
উপন্যাসের পাতা খেড় দিয়ে কেটে সত্ত্বর পৃষ্ঠা করে দিয়েছি। একটা পাতার
পরেই তারপরের পাতা মিসিং। দেখতে চাছি উনি ব্যাপারটা ধরতে পারেন
কিনা।’

‘ধরতে পারছেন ?’

‘না। উনি খুব আগ্রহ নিয়ে উপন্যাসটা পড়ছেন। প্রায় শেষ করে
ফেলেছেন।’

বাদল মুঝ গলায় বলল, ‘দস্তয়েভক্রি উপন্যাস থেকে উঠে আসা
কারেক্টর। হিমুদা, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।’

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, ‘স্যার
এর নাম বাদল, আমার খালাতো ভাই। দু'দিন আমার সঙ্গে থাকবে, খাবে।
তবে বিনিময়ে কাজ করে দেবে। ফ্লের মুছবে। কাপড় ধুয়ে দিবে। লকারটা
খোলার ব্যাপারেও কাজ করবে। এর অংকের মাথা ভাল।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘গুড! ভেরি গুড!’

বাদল বলল, ‘স্যার, যে বইটা পড়ছেন সেটা পড়তে কেমন লাগছে ?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘পড়তে খুবই ভাল লাগছে। তবে বইয়ের
অনেকগুলো পাতা নেই। কেউ একজন ইঙ্গেল নাথার দিয়ে শুরু প্রতিটি পাতা
কেটে রেখেছে। তাতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না, বরং সুবিধা হচ্ছে।’

বাদল আগ্রহ নিয়ে বলল, ‘কি সুবিধা, স্যার ?’

‘মিসিং পাতাগুলোতে কি আছে কল্পনা করে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আমি
ঠিক করেছি, এরপর যে বই-ই পড়ব তার odd কিংবা even নাথারের
পাতাগুলো কেটে রাখব।’

বাদল বলল, ‘স্যার, আপনিতো মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। দয়া করে
একটা বাণী দিন।’

‘কি বাণী দেব ?’

বাদল বলল, ‘আপনার মতো মানুষ যা বলবেন সেটাই বাণী। একটা গালি যদি দেন, সেটাও হবে বাণী। দয়া করে আমাকে একটা গালি দিন।
‘সত্যি গালি দেব ?’

‘জু স্যার।’

‘এই মুহূর্তে তেমন কোনো গালি মনে পড়ছে না। একটু পরে দেই ?’
‘জু আচ্ছা স্যার।’

বাদল আগ্রহ নিয়ে গালির জন্যে অপেক্ষা করছে। পল্টু স্যারকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। সভবত লাগসই গালি পাচ্ছেন না। না পাওয়ারই কথা। বাংলা ভাষায় গালির সম্ভাব তত উন্নত না। বেশির ভাগ গালিই পশ্চর সঙ্গে সম্পর্কিত— কুকুরের বাচ্চা, শুওরের বাচ্চা, গাধার বাচ্চা... নতুন ধরনের গালি কিছু হয়েছে, যেমন— তুই রাজাকার। আরো গালি থাকা দরকার। একটা জাতির সংস্কৃতির অনেক পরিচয়ের একটি হচ্ছে গালির সম্ভাব। চীন দেশে গালির অভিধান পর্যন্ত আছে। আহারে কী সভ্যতা!

স্যারের ড্রাইভার এসে দরজা দিয়ে মুখ বের করে চোখ টিপল। চোখ টিপায় এর সীমাহীন পারদর্শিতা। চোখ টিপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল— বিরাট সমস্যা।

আমি কাছে গিয়ে বললাম, ‘কি সমস্যা ?’

ড্রাইভার হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, ‘কিসলু ভাই আসছে। একা আসে নাই, দলেবলে আসছে।’

‘কিসলু ভাইটা কে ?’

‘সোহাগ ভাইজানের গ্রন্থের লিভার। ডেনজার আদমি। আপনারে খবর দিতে বলেছে, খবর দিলাম। এখন আপনে কি করবেন, সেটা আপনার বিবেচনা।’

‘আমাকে কি করতে বল ?’

‘পালায়া যান। জানে বাঁচেন।’

‘জানে মেরে ফেলার সম্ভাবনা কি আছে ?’

‘অবশ্যই। বললাম না, ডেনজার আদমি।’

‘পালাবো কোন দিক দিয়ে ? এরচে বরং ডেনজার আদমির সঙ্গে কথা বলতে থাকি। সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে ঝেড়ে দৌড়। এক দৌড়ে পগার পার।’

ড্রাইভার শুকনো মুখে বলল, ‘আমার যা বলার বলে দিয়েছি। আরেকবার বলতেছি— ডেনজার আদমি।’

ডেনজার আদমি কিসলু ভাই, ড্রাইভারের ঘরের সামনের চেয়ারে বসে আছে। সে জিসের প্যান্টের সঙ্গে কমলা রঙের পেঞ্জি পরেছে। পেঞ্জিতে লেখা— Love Bangladesh. বঙ্গ প্রেমিকের চেহারায় ইঁদুর ভাব আছে। সব মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে তা-না। কিছু মনে হয় ইঁদুর থেকেও এসেছে। আমি ডেনজার আদমির কাছে এগিয়ে গেলাম। ড্রাইভার অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। ডেনজার আদমির লোকজন কাউকে দেখছি না। তবে তারা আশেপাশেই যে আছে তা ডেনজার আদমির প্রশান্ত মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি। এই ধরনের বিপজ্জনক লোক একা যখন থাকে তখন অসহায় বোধ করে। আমি ডেনজার স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, এই তুই চাস কিরে শওরের বাঢ়া ?'

ড্রাইভারের মুখ থেকে জুলন্ত সিগারেট পরে গেল। সে মাথা ঘুরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো। মনে হচ্ছে তার পৃথিবী উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'এখনো চেয়ারে বসে আছিস! উঠে দাঁড়া তেলাপোকার ছানা!' (তেলাপোকার ছানা গালিটা বের করে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আরো কিছু নতুন গালি আবিষ্কার করে ফেলব।)

'এই তেলাপোকা! তোর নাম কি ?'

হতভস্ব ডেনজার আদমি, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কিসলু।'

'আমার কাছে এসেছিস কি জন্যে ? তোকে কি সোহাগ পাঠিয়েছে ? ঐ মাকড়সাটা এখন কোথায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ?'

'হঁ।'

'হঁ কিরে হারামজাদা! বল জু স্যার। তোকে আজ মহুবত শিখায়ে দিব। সোহাগের রাজস্থানী চাকুটা প্যান্টের ভিতর আপনা-আপনি খুলে গেছে। ঠিক বলেছি না ?'

'জু স্যার।'

'তোর প্যান্টের পকেটেওতো পিস্টল আছে। আছে কি-না বল ?'

'জু স্যার।'

'গুলি নাই, পিস্টল নিয়ে ঘুরছিস কোন মতলবে ? পিস্টলের গুলি কই ?'

ডেনজার আদমি বিড়বিড় করে বলল, 'যে গুলি আছে সেটা এই পিস্টলে ফিটিং হয় না।'

'পিস্টল আর গুলি দেখেওনে কিনবি না ? আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস বটপট বল।'

'ভুল হয়েছে। আপনাকে চিনতে পারি নাই।'

'এখন চিনেছিস ?'

ডেনজার আদমি কিসলু হতাশ চোখে এদিক-ওদিক তাকালো। সে এমনই হতভব হয়েছে যে, মাথা এলোমেলোর পর্যায়ে চলে গেছে। ডেনজার আদমি জাতীয় ছেলেপুলেরা অসম্ভব ভীতু হয়।

‘ওস্তাদ, বিদায় দেন, চলে যাই।’

‘কানে ধর। কানে ধরে লেফট রাইট করতে করতে ধা। তোর বন্ধুরা সবাই ঘেন দেখে তুই কানে ধরে আছিস। আর শোন, পিস্টলের জন্যে ফিটিং গুলি যেদিন পাবি সেদিন এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। মনে থাকবে?’

‘জু ওস্তাদ।’

‘এখনো কানে ধরছিস না কেন? কানে ধর!’

ডেনজার আদমি কানে ধরল। ড্রাইভারের মুখের হা এতই বড় হয়েছে যে, মুখের ভেতর দিয়ে খাদ্য নালীর খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

‘হাঁটা শুরু কর। এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। আবার এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। মনে থাকবে?’

‘মনে থাকবে, ওস্তাদ।’

ডেনজার আদমি চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে টোক গিলছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘হামকি ধামকি করে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি— তাই না ফজলু?’

ফজলু বিড়বিড় করে বলল, ‘জু ওস্তাদ।’

মানুষের সবদিন সমান যায় না। কোনো কোনো দিনকে বলা যায় ভেজিটেবল ডে। তাও উল্লেখযোগ্য ভেজিটেবলও না। কদু টাইপ ভেজিটেবল। আবার কিছু দিন থাকে— সংবাদপত্রের ভাষায় ঘটনাবহুল।

যেমন আজকের দিন। ডেনজার আদমি কিসলু ভাইকে বিদায় করে উপরে এসেছি। পল্টু স্যার হাতের উপন্যাস ছুড়ে ফেলে বললেন, ‘অসাধারণ উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। টানটান উত্তেজনা। দুপুরের খাবার দাও। দেখি নতুন বাবুর্চি ইলিশ মাছের ডিম কেমন রান্না করেছে। আমার মন বলছে, ভাল হয়েছে।’

বাবুর্চি নেই, ডিমও নেই— এই দুঃসংবাদ দেয়ার আগেই দরজার কলিংবেল বাজল। ঘরে চুকল রান্না। হাতে টিফিন কেরিয়ারের একটা বাটি।

আমি বললাম, ‘কি এনেছ, ডিমের ঝোল?’

রান্না কিছু বলল না। হ্যাঁ, সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে-মুখে আঘাতের ঘনঘটা। আমি বললাম, ‘স্যারকে খাবার দাও। স্যারের ক্ষিধে লেগেছে।’

রান্না বলল, ‘আপনার মাজেদা খালা আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।’

আমি বললাম, ‘চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে তুমি কাজে লেগে পর। বাদল তোমাকে সাহায্য করবে। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিতে হবে। বাসাবাড়ির কাজ প্রথম করছেতো! এমিতে সে ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ায়।’

বাদল মেঝে ঝাট দিচ্ছিল। রানু তার দিকে তাকিয়ে রইল। রানুর ভাবভঙ্গি অধিক শোকে কংক্রিট টাইপ।

মাজেদা খালা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। শুরু করেছেন একটি নিরীহ প্রাণীকে দিয়ে—

এই গাধা,

তুই কি শুরু করেছিস। রানুকে কি বুঝিয়েছিস। মেয়েটা আমার কাছে এসে কেঁদে-টেদে অস্থির। সব সময় রহস্য করা যায় না। মানুষকে স্বাভাবিক আচরণ করতে হয়। বয়সতো কম হয় নি। এখন স্বাভাবিক হ্বার চেষ্টা করে দেখ।

আমি কয়েকদিন কথা বলে দেখেছি রানু মেয়েটা ভাল। ভাল মেয়েদের কপালে দৃঃখ থাকে। এই মেয়ের কপালেও নানান দৃঃখ। বেচারি এত কষ্ট করে ঢাকায় আছে। গ্রামে তার মা একা। সেই মায়ের কাছে চিঠি গেছে যে, রানু ঢাকায় বেশ্যাগিরি করে জীবন যাপন করে। সন্ধ্যার পর থেকে তাকে না-কি চন্দ্রিমা উদ্যানে পাওয়া যায়।

রানু যে হোষ্টেলে থাকে সেখানকার কোনো মেয়েই কাজটা করেছে। হোষ্টেল থেকেও রানুকে নোটিশ দিয়েছে যেন হোষ্টেল ছেড়ে যায়। সে এখন যাবে কোথায়? তার থাকার জায়গা দরকার। টাকা-পয়সা দরকার। রানুর কাছে শুনলাম তুই বাগড়া দিচ্ছিস যেন পল্টু ভাইজান কিডনী না কেনেন। এটা কেমন কথা?

মেয়েটাকে আমি আবার পাঠালাম। তোর দায়িত্ব আজকালের মধ্যে কিডনীর বিষয় ফাইনাল করে আমাকে জানানো। ভাল কোনো ছেলে পাওয়া গেলে আমি নিজ খরচায় মেয়েটার বিয়ে দিতে চাই। তোর সন্ধানে কেউ কি আছে?

আচ্ছা শোন! তোর পাতানো খালার ছেলে বাদলা ঐ ছেলেতো এখনো বিয়ে করে নি। ওর সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায় না?

ইতি
তোর মাজেদা খালা

পুনর্চ ১ : পল্টু ভাইজান না-কি ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খেতে চেয়েছেন। রেঁধে পাঠালাম। উনার কেমন লাগল জানাবি। ঝাল মনে হয় একটু বেশি হয়ে গেছে। এখনকার বাজারে সবই মিষ্টি টাইপ কাঁচামরিচ। এটা যে এত ঝাল, আগে বুঝতে পারি নি।

পুনর্চ ২ : কি লিখতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পল্টু ভাইজানের শোবার ঘরে আমার ছবিটা কি এখনো ঝুলছে? এই ছবি যে আমার কিশোরী বয়সের, তা রানুকে বলবি না। সে যদি নিজে থেকে বুঝে ফেলে তাহলে ভিন্ন কথা।

পল্টু স্যারের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার জব পার্মানেন্ট। যাবো মধ্যে মনে হয় ভাল-মন্দ খাবার জন্যে বেঁচে থাকি। নবরত্ন সভার আবুল ফজলের নাম শনেছ?’

রানু বলল, ‘না।’

‘তিনি মোঘল সন্ত্রাট আকবর দ্যা প্রেটের নয় রঞ্জের এক রঞ্জ। তিনি আকবরের একটা জীবনী লিখেছেন, নাম “আইন-ই-আকবরী”。 সেখানে সন্ত্রাট আকবর কি কি খেতেন সেই সব লেখা আছে। মরে যাবার আগে তাঁর পছন্দের একটা খাবার খেতে ইচ্ছা করছে। রেসিপিও উনি লিখে গেছেন। রেসিপি বললে রাঁধতে পারবে?’

‘রেসিপি কি?’

পল্টু স্যার আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ‘খাবারটার নাম দুনিয়াজা। দশ সের মাংসের সঙ্গে দশ সের পিয়াজের রস মিশাতে হবে। এক পোয়া লবণ দিতে হবে। কিছু গোলমরিচের গুঁড়া। তারপর অল্প অঁচে জ্বাল হতে থাকবে।’

‘আর কিছু না?’

‘আর কিছুতো লেখা ছিল না।’

রানু বলল, ‘চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে খেতে পারবেন বলে মনে হয় না। তেল ঘি ছাড়া কেমন হবে খাবারটা?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘পিয়াজের রসে রান্নাই এই খাবারের বিশেষত্ব। হিমু বাবুর্চির কাছ থেকে জেনে নাও কি কি লাগবে। আজ রাতে আমি আকবর বাদশা। দুনিয়াজা খাব।’

রানু বলল, ‘আমাকে বাবুর্চি ডাকবেন না। আমার নাম রানু। আমাকে রানু ডাকবেন। আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিন যেখানে আমি রাতে থাকব। হোস্টেল থেকে আমার কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে।’

বাদল বলল, ‘আমি আপনার সঙ্গে যাব। সব নিয়ে আসব।’
ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে কে জানে।

সক্ষ্যা সাতটা। রান্নাঘরে দুনিয়াজ্ঞা রান্না হচ্ছে। সাহায্যকারী পরামর্শদাতা হচ্ছে বাদল। তার উৎসাহ তুঙ্গস্পর্শী। মনে হচ্ছে রানু বাবুর্চির এসিস্টেন্ট হয়ে সে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। একটু পরপর রানুর হাসির শব্দও আসছে। বাদলের হাসির আওয়াজ পাওয়া না। দু’জন মানুষের মধ্যে একজন যখন হাসে তখন অন্যজনকেও হাসতে হয়। বাদল হাসছে না কেন বুঝতে পারছি না। দু’জনের কথাবার্তাও ইতোমধ্যেই রহস্যজনক হয়ে আসছে।

রানু : রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ধোয়ায় আপনার কষ্ট হচ্ছে।
বাদল : তোমারও তো কষ্ট হচ্ছে। তুমিতো ধোয়া প্রক্ফ না।
রানু : মেয়েদের আবার ধোয়ার কষ্ট!
বাদল : তোমরা মেয়েদের এত ছোট করে দেখ কেন?
রানু : আপনারাই আমাদের ছোট করে রাখেন।
বাদল : খুবই ভুল কথা বলছ রানী।
রানু : রানী বলছেন কেন? আমার নাম রানু।
বাদল : সবি, ভুলে রানী বলে ফেলেছি। স্লিপ অব টাং।
রানু : সবার সামনে এ রকম স্লিপ অব টাং যেন না হয়। অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে।
বাদল : অন্য কি ভাববে?
রানু : ইস্। আপনি বোকা না-কি? কেন বুঝতে পারছেন না?
বাদল : রানী, আসলেই বুঝতে পারছি না।
রানু : আবার রানী! শুনুন, প্রেমিকরাই শুধু তাদের প্রেমিকাদের রানী বলে ডাকে কিংবা জানপাখি ডাকে। খুবই হাস্যকর।
বাদল : হাস্যকর কেন হবে?
রানু : আমার কাছে হাস্যকর।

আমি মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ঘুমুবার আয়োজন করছি— বাদল হস্তদণ্ড হয়ে চুকল। হাতে মোবাইল টেলিফোন।

‘হিমুদা! বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতো! বাবা কিছু না বুঝেই চিংকার চেচামেচি করছে। তুমি পুরো বিষয়টা সুন্দর করে গুছিয়ে বল।’

আমি গঞ্জীর গলা বের করলাম, ‘হ্যালো।’

খালু সাহেব ধমকে উঠলেন, ‘হিমু না।’

‘জু।’

‘এ রকম করে কথা বলছ কেন ? সমস্যা কি ?’

‘কোনো সমস্যা নেই।’

‘বাদলের ব্যাপারটা কি আমাকে বল। কিছুই লুকাবে না। সে করছে কি ?’

‘এই মুহূর্তে সে সন্দেহজনক চরিত্রের এক বাবুচি মহিলার এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে পিয়াজ কেটে দিচ্ছে এবং নিচু গলায় গল্লগুজব করছে।’

‘What ?’

‘সত্যি কথা জানতে চাচ্ছেন, সত্যি কথা বললাম। তবে বাবুচিটার চেহারা ভাল। চরিত্র সন্দেহজনক হলেও চেহারা খারাপ না।’

‘সন্দেহজনক চরিত্র মানে কি ?’

‘সন্ধ্যার পর চন্দ্রিমা উদ্যানে কাষ্টমারের খোজে ঘুরে বলে জনশ্রুতি আছে।’

‘বাদল ওর সঙ্গে জুটল কিভাবে ?’

‘বলতে চাচ্ছি না, খালু সাহেব।’

‘কেন বলতে চাচ্ছ না ?’

‘হয়ত ব্যাপারটা আপনি সহজভাবে নিতে পারবেন না।’

‘হিমু কেড়ে কাশ। কেড়ে কাশ বললাম। I order you to catch.’

‘বাদল যে বাসায় পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে সন্দেহজনক চরিত্রের এই মেয়েও সেই বাড়িতেই কাজ করে।’

‘কি বললে ? বাদল পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে ?’

‘জু। মহানন্দে ঘর ঝাট দিচ্ছে। মেঝে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুচছে। আমার ধারণা ছাত্র পড়ানোর মনোটনি কাটানোর জন্যে সে এই কাজ করছে।’

খালু সাহেব টেলিফোনে সিংহনাদ করলেন, ‘বাদলকে টেলিফোনটা দাও! আমি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলব।’

আমি বিনীত গলায় বললাম, ‘বাদলকে টেলিফোন দিতে হলে আমাকে রাখ্নাঘরে যেতে হয়। কাজটা করতে চাচ্ছি না। তাদের কি অবস্থায় দেখব কে জানে। বললাম না মেয়েটার চরিত্র সন্দেহজনক।’

‘বাদল কোন বাসায় আছে সেই ঠিকানা দাও— আমি আসছি।’

আমি ঠিকানা দিয়ে বললাম, ‘আজ না এসে আপনি বরং আগামীকাল সন্ধ্যায় আসুন।’

‘আজ এলে সমস্যা কি ?’

‘আজ বৃহস্পতিবার। আপনার বোতল দিবস। আজ এলে আপনার বোতল দিবসটা ঘাটি হবে। কাল সন্ধ্যায় আসুন, হাতেনাতে আসামি গ্রেণ্টার করে নিয়ে যান।’

‘বাদল কি সত্যি চাকরের কাজ নিয়েছে?’

‘জু! তবে পার্ট টাইম কাজ। এটা একটা আশার কথা। খালু সাহেব, বুবাতে পারছি আজ আপনার মন খুবই অশান্ত। এক কাজ করেন, আজ একটু সকাল সকাল ছাদে চলে যান। ওমর বৈয়াম বলেছেন—

‘রাখ তোমার ওমর বৈয়াম। আমি কি চীজ, বাদল কাল সন্ধ্যায় জানবে।’

রানু-বাদল কথামালা আবার শুরু হয়েছে। আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি এবং কথা শুনছি।

রানু : জানেন, আমার খুব শখ টিভি নাটকে অভিনয় করা। কিন্তু এত বাজে চেহারা কে আমাকে নেবে বলুন।

বাদল : তোমার চেহারা খারাপ কে বলল?

রানু : সবাই বলে।

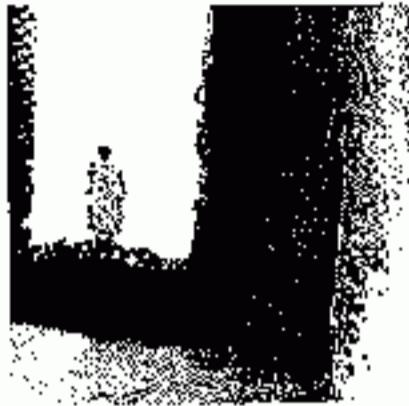
বাদল : আমার সামনে বলে দেশুক।

রানু : আপনার সামনে বললে আপনি কি করবেন?

বাদল : আমি ঘুঁসি দিয়ে নাকসা ফাটিয়ে দেবো।

রানু : (হাসি)।

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুবা যাচ্ছে।



লেখকরা আনন্দিত মানুষের বর্ণনা নানানভাবে করেন। কেউ লেখেন—“লোকটা আনন্দে ঝলমল করছে।” কেউ লেখেন—“সে আনন্দে আটখানা।” রবীন্দ্রনাথ লেখেন “বিমলানন্দের চাপা আভায় তাহার মুখমণ্ডলে...।”

এই মুহূর্তে আমি যাকে দেখছি তার আনন্দ কবি-সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আনন্দে আটখানার জায়গায় আনন্দে এগারোখানা বলতে পারি। তাতেও ইতর-বিশেষ হয় না।

আনন্দিত ভদ্রলোকের নাম আবদুস সাত্তার। ডবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক MC. MR. PL. শেফা ক্লিনিকের কর্ণধার। তিনি বসে আছেন পল্টু স্যারের সামনের বেতের চেয়ারে। তাঁর হাতে হলদিগামের শনপাপড়ির প্যাকেট। সন্দেশ রসগোল্লার মরণঘন্টা সন্তুষ্ট বেজে গেছে। হলদিগাম বাবুরা বেঁচিয়ে সব বিদায় করার সংকল্পে নেমেছেন।

সাত্তার সাহেব শনপাপড়ির প্যাকেট পল্টু স্যারের দিকে এগিয়ে বললেন, ‘নে, তোর জন্যে এনেছি। ধিয়ে ভাজা শনপাপড়ি। অমৃতের কাছাকাছি।’

পল্টু স্যার হাত বাড়িয়ে প্যাকেট করা অসূত নিলেন।

সাত্তার সাহেব বললেন, ‘তোর চাকরটাকে বল, প্যাকেট খুলে সুন্দর করে সাজিয়ে মিষ্টি দিতে। ওটার নাম যেন কি কাঞ্চনজঙ্গা না?’

‘ওর নাম হিমু।’

সাত্তার সাহেব আমাকে ডাকার আগেই আমি ছুটে গেলাম। চাকরদের মত আনাড়ি হাতে প্যাকেট খুলতে গিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট মেঝেতে ফেলে দিলাম। সাত্তার সাহেবের ধর্মক দেয়ার কথা। ধর্মক দিলেন না। মধুর গলায় বললেন, ‘ভাল আছিস?’

‘জি স্যার, ভাল আছি।’

‘একটা শনপাপড়ি তুই নিয়ে যা। আরাম করে থা।’

আমি বললাম, ‘স্যার, একটা নিলে হবে না। আমরা চারজন। অনুমতি দিলে চার পিস নিয়ে যাই।’

‘চারজন মানে কি ?’

‘আমি, স্যারের ড্রাইভার, স্যারের বাবুচি, পাট টাইম ক্লিনার।’

সাতার সাহেব চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, ‘টাকা পয়সারতো দেখি হরির লুট হচ্ছে। সব বক্ষ। এখন থেকে পুরো কন্ট্রোল আমার হাতে। হিমু, তুই যা, কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেতে থেতে আমি বুঝিয়ে বলব, কেন পুরো কন্ট্রোল আমার হাতে। পল্টু, তুমিও বই পড়া বক্ষ করে আমার কথা শোন। তোমারও শোনা প্রয়োজন।’

আমাদের সবার হাতে হলদিরামের একপিস করে শনপাপড়ি। সাতার সাহেবের হাতে চায়ের কাপ। পল্টু স্যারের হাতে একটা বই, নাম—“বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান।” লেখকের নাম প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য। বই পড়ায় বাধা পড়েছে বলে স্যার বিরক্ত। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না বলে আরো বিরক্ত। কম্পাউন্ড ইন্টারেন্টের মতো কম্পাউন্ড বিরক্তি।

সাতার সাহেব খাকাড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, ‘এখন আমি একটা সংবাদ দেব। সংবাদটা তোমাদের জন্যে আনন্দেরও হতে পারে, আবার নিরানন্দেরও হতে পারে। সংবাদটা হচ্ছে— পল্টুর বিষয়ে সম্পত্তির বিষয়ে কোট একটা অর্ডার জারি করেছে। আমাকে পাওয়ার অব এটর্নি দিয়েছে। পাওয়ার অব এটর্নির ফটোকপি আমার কাছেই আছে। চাইলে দেখতে পার। কেউ দেখতে চাও ? দেখতে চাইলে আওয়াজ দাও।’

আমরা চারজনই একসঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়লাম— দেখতে চাই না। ‘পাওয়ার দেখাতে আনন্দ নেই, পাওয়ার না দেখাতেই আনন্দ।’

সাতার সাহেব পল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুই দেখতে চাস ?’

পল্টু স্যার বললেন, কি দেখতে চাইব ?

‘পাওয়ার অব এটর্নি ?’

‘খামাখা এসব দেখতে চাইব কি জন্যে ? জরুরি একটা বই পড়ছি।’

‘ঠিক আছে, তুই বই পড়তে থাক। আমি চা-টা শেষ করে এদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকি।’

পল্টু স্যার গভীর মনযোগে পাঠ শুরু করলেন। আমি তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম। তিনি পড়ছেন আতা গাছ। আতা গাছ যে বিষাক্ত আমার জানা ছিল না। জানা গেল, ফল ছাড়া এই গাছের সবই বিষাক্ত। একটি বিষাক্ত গাছ মিষ্টি ফল দিচ্ছে, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মানুষের মধ্যেও কি এ রকম আছে ? বিষাক্ত বাবা-মা’র অসাধারণ সন্তান।

সান্তার সাহেব গলা খাকাড়ি দিয়ে আমার দিকে চোখ ইশারা করলেন। আমি ছুটে গেলাম, তাঁর হাত থেকে চায়ের খালি পেয়ালা নিয়ে গেলাম। তিনি আয়েসী ভঙ্গিতে বললেন, ‘তোমাদের স্যার যে মানসিকভাবে পঙ্গু একজন মানুষ, আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা বুঝেছ। হিমু, বল তুমি বুঝেছ?’
‘ইয়েস স্যার।’

‘ডাঙ্গারুরা তাঁর বিষয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। ডাঙ্গারদের সার্টিফিকেট বিষয়ে তোমাদের কোনো কথা আছে?’

আমি বললাম, ‘স্যার, কথা নাই। যে লোক দিনরাত বই পড়ে এবং পায়ে ফ্যানের বাতাস দেয় সে তো মানসিক ভারসাম্যহীন বটেই।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘গুড! তুই ইন্টেলিজেন্ট। তোকে আমার পছন্দ হচ্ছে। শুরুতে বদমাইশ টাইপ মনে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে না।’

আমি ছুটে গিয়ে সান্তার সাহেবকে কদম্বুসি করে ফেললাম। চাকরশ্রেণীদের নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে— প্রশংসাসূচক কিছু শুনলেই অতি দ্রুত কদম্বুসি করা তার একটি। সামান্য ধর্মক দিলে আড়ালে অশ্রু-বর্ষণও নীতিমালার অংশ। আড়ালেরও বিশেষত্ব আছে। আড়ালটা এমন হতে হবে যে যিনি ধর্মক দিয়েছেন তিনি দেখতে পান।

‘হিমু!’

‘জি স্যার।’

‘তোর স্যারের বিশাল বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে তোরা অবগত আছিস কিনা আমি জানি না। আমার কাছে শুনে রাখ। তার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টই আছে। মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের কাছে এতবড় সম্পত্তি থাকা ঠিক না। দেখা যাবে হঠাতে উইল করে সে সম্পত্তি লিখে দিল— তার পোষা বিড়ালকে। বা কুকুরকে।’

আমি বললাম, ‘স্যারের কোন পোষা কুকুর-বিড়াল নাই।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘আমি কথার কথা বলছি। যাই হোক, এই সমস্ত নানান বিবেচনার প্রেক্ষিতে কোট আমাকে পাওয়ার অব এটর্নি দিয়েছে। তার যাবতীয় বিষয় আমি দেখব। সে ব্যাংকের সঙ্গে কোন রকম লেনদেন করতে পারবে না। যে বিপুল অপচয় সংসারের জন্যে করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। পল্টু কখনো গাড়ি নিয়ে কোথাও যায় না। অকারণে একটা গাড়ি পড়ে আছে। মাসে মাসে ড্রাইভারের বেতন গোলা হচ্ছে। আজ থেকে ড্রাইভার অফ।’

ড্রাইভার বলল, ‘স্যার, এটা আপনি কি বলেন?’

সাত্তার সাহেব বললেন, ‘কি বলি কানে শুন না ? কানে ঠসা লোক গাড়ি কিভাবে চালাবে ? পেছন থেকে গাড়ি ডাবল হৰ্ন দিলেও তো কিছু শুনবে না । তোমার চাকরি ডাবল অফ । যাও নিচে যাও । পাওনা বেতন থাকলে মিটিয়ে দেয়া হবে ।’

ড্রাইভার নিচে নেমে গেল । সাত্তার সাহেব বাদলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার ডিউটি কি ?’

বাদল কিছু বলার আগেই আমি বললাম, ‘সে, সে আমার First এসিস্টেন্ট ।’

‘তোর আবার এসিস্টেন্টও লাগে ? এসিস্টেন্টের চাকরি অফ । নাম কি ? নাম বলে নিচে চলে যা । কি নাম ?’

‘বাদল ।’

‘ঝড় তুফান বৃষ্টি বাদলা এই বাড়িতে চলবে না ।’

কিছুক্ষণের মধ্যে রানুর চাকরিও চলে গেল । তাকেও নিচে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়াতে হল ।

এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু পল্টু স্যার নির্বিকার । তিনি বিষাক্ত গাছপালা নিয়েই আছেন । এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে সুখি কেউ পৃথিবী নামক এহে আছে তা মনে হচ্ছে না ।

আমি সাত্তার সাহেবের কাছে সামান্য এগিয়ে নিচু গলায় বললাম, ‘স্যার, আপনি হিসাবে ভুল করছেন ।’

সাত্তার সাহেব খ্যাকখ্যাক করে বললেন, ‘আমি হিসাবে ভুল করছি মানে ? কিসের হিসাব ? কিসের ভুল ? তুই আমার ভুল ধরার কে ?’

আমি মাঠে নামলাম । হোমিওপ্যাথ সাহেবের যন্ত্রণা অনেকক্ষণ সহ্য করা গেছে । আর না । এখন যুদ্ধৎ দেহি ।

আমি বললাম, ‘তুই তোকারি অনেকক্ষণ ধরে করছিস । আর একবার তুই বললে কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলব । তোকে নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে । আজ তুই আভারওয়ার পরে আসিস নাই কেন ? তাহলে আভারওয়ার পরে নামতে পারতি, কিছুটা ইজ্জত রক্ষা হতো ।’

সাত্তার সাহেব হঠাৎ গভীর জলে পড়ে গেলেন । তাঁর মস্তিষ্ক খানিকটা জট পাকিয়ে গেল । চাকরশ্রেণীর একজন এমন কথা কিভাবে বলছে— মস্তিষ্ক তার লজিক খুঁজছে । লজিক দ্রুত খুঁজে না পেলে কম্পিউটারের মতো সিস্টেম হ্যাঙ্গ করবে । সাত্তার সাহেব ঘামতে শুরু করেছেন । তাঁর চোখ লাল । হ্যাঙ্গ হবার দিকেই তিনি যাচ্ছেন ।

আমি এবার তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। তাঁর মণ্ডিক ঠাণ্ডা করার জন্যে
বললাম, ‘তোকে দেখে মনে হয় তুই ইন্টেলিজেন্ট লোক। তোর সঙ্গে কয়েকবার
আমার দেখা হয়েছে। আমাকে চিনতে পারিস নাই? আমি CID-র লোক।
আমাকে রাখা হয়েছে যেন আমি পল্টু সাহেবের কোনো বিপদ হয় কি-না সেটা
দেখার জন্যে। বিশ্বাস হয়?’

সান্তার সাহেব হা করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ব্রেইন এখনো ‘হ্যাঙ’
অবস্থায় আছে। আমি বললাম, ‘একটা কাজ করলেই তুই বিশ্বাস করবি।
দ্বিতীয় প্রশ্ন আর মাথায় আসবে না।’

আমি কথা শেষ করেই বাঁ হাতে আচমকা এক চড় বসিয়ে দিলাম।
সান্তার সাহেব চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন।
অস্ফুট শব্দও করলেন—‘ও খোদা রে!’

পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হৰে বললেন, ‘কি হচ্ছে?’

আমি বললাম, ‘কিছুই হচ্ছে না স্যার, সামান্য আর্গুমেন্ট।’

‘আর্গুমেন্ট বাইরে গিয়ে কর। তোমাদের যন্ত্রণায় পড়তেও পারছি না।’

আমি সান্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বললাম, ‘স্যার,
চলুন, আমরা বসার ঘরে যাই। নিজেদের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে তার
সমাধান করি। কুন্ড দ্বার বৈঠক।’

সান্তার সাহেব নিঃশব্দে বসার ঘরে চলে গেলেন। তিনি এখনো বিশ্বাস
অবিশ্বাসের সীমাবেধায় আছেন। এখন থেকে বের হতে তাঁর সময় লাগবে।

বসার ঘরে আমরা দু’জন মুখোমুখি বসে আছি। সান্তার সাহেব কিছু বলার
পরিকল্পনা নিয়ে কয়েকবার গলা খাকাড়ি দিলেন। কিছু বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, ‘ইচ্ছা করলে আমার বিষয়ে CID অফিসে খৌজ নিতে
পারিস। হায়ার লেভেলে খৌজ নিতে যাবি। বলবি সিরাজুল ইসলাম নাম।
হিমু আমার ছদ্মনাম।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। আপনি পুলিশের
লোক হোন আর যেই হোন, আমি কোর্টের অর্ডার নিয়ে এসেছি। দু’জন
ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে যে পল্টু পাগল। একজন হলেন প্রফেসর
কেরামত আলি, এসোসিয়েট প্রফেসর অব সাইকিয়াট্রি।’

আমি বললাম, ‘পয়সা দিলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। দু’জন
ডাক্তার বলেছে পল্টু স্যার পাগল। দশজন বলবে পাগল না। হাইকোর্টে
আপিল হবে। উল্টা মামলা হবে যে, সুস্থ মানুষকে পাগল সাজিয়ে সম্পত্তি
দখলের ঘড়্যন্ত।’

‘মামলা মোকদ্দমা আমি ভয় পাই না।’

‘ভয় না পাওয়া ভাল। আমি একটা প্রস্তাব দেই?’

‘কি প্রস্তাব?’

আমি কিছুক্ষণ শীতল চোখে তাকিয়ে তুই থেকে আপনিতে উঠে এলাম।
গলার স্বর নিচু করে বললাম, ‘আমাকে দলে নিন। পল্টু স্যারের সম্পত্তির
পার্সেন্টেজের বিনিময়ে আমি আপনার হয়ে কাজ করব।’

‘কত পার্সেন্টেজ?’

‘আপনিই বলুন কত। গুরুত্ব বুঝে বলবেন।’

সান্তার সাহেব চূপ করে আছেন। বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধায়
পড়ারই কথা। আমি বললাম, ‘বাসায় যান। বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা
করুন। আমার নিজের প্রস্তাব হল ফিফটি-ফিফটি। যদি আমার প্রস্তাবে রাজি
থাকেন কিসলুকে দিয়ে একটা শাদা গোলাপের তোড়া পাঠাবেন। শাদা হচ্ছে
সন্ধির প্রতীক।’

‘কিসলুটা কে?’

‘আমি বললাম, ‘নাম শনে মনে হল আকাশ থেকে পড়েছেন। কিসলু
আপনার ছেলের বন্ধু। একটা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পিস্তলের যে গুলি
আছে সেটা পিস্তলে ফিট করে না। চিনেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘চা খাবেন?’

‘না।’

‘পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করুন। একটা আপনি হাতে
নিন, একটা আমার হাতে দিন। সিগারেটের রঙ শাদা। দু’জন দু’জনকে শাদা
লাঠি দেখাচ্ছি। তার মানে কি বুঝতে পারছেন? শান্তির চেষ্টা।’

সান্তার সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা
বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। ভদ্রলোকের ব্রেইন এখনো পুরোপুরি কাজ
করছে না।

আমি সিগারেট উঁচু করে বললাম, ‘শান্তি। শান্তি। শান্তি।’

সান্তার সাহেবও বিড়বিড় করে বললেন, ‘শান্তি শান্তি।’ আমি বললাম,
‘আপনি সিগারেট ধরিয়ে ধোয়া ছাড়ুন। আপনি যেখানে ধোয়া ছাড়বেন
আমিও সেখানে ধোয়া ছাড়ব। মানুষ শান্তির পতাকা উড়ায়, আমরা উড়াব
শান্তির ধোয়া। ঠিক আছে?’

‘হ্যাঁ।’

শান্তির ধোয়া উড়ানো হল। শান্তির ধোয়া উড়িয়ে সাতার সাহেব আরো
জরুরিদুর্বল হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'বাসায় চলে যান। ঘুমের ট্যাবলেট
খেয়ে লম্বা ঘুম দিন। মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনাকে ঘুম দরকার।'

'হ্যাঁ।'

'একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারবেন, না-কি আমার সাহায্য লাগবে ?'

'একা নামতে পারব।'

'গুড়। তাহলে বিদায়। মনে রাখবেন, আমার অফার ফিফটি-ফিফটি।'

অল কোয়ায়েট অন দি ইষ্টার্ন ফ্রন্ট। ভুল বললাম, সব ফ্রন্টেই শান্তি। ঘরের
কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে আবার শুরু হয়েছে। রানু রান্না শুরু করেছে। বাদল
আছে সহকারী।

আজকের মেনু—

চিংড়ি মাছ দিয়ে করলা।

মলা মাছের চচড়ি।

কুমড়া ফুলের বড়া।

চিতল মাছের গাদা দিয়ে কোঞ্চা।

স্ট্যান্ড বাই আইটেম খাসির কলিজা ভুনা।

কলিজা মশলা মাখিয়ে রেডি করা। সময় পাওয়া গেলে রান্না হবে। সময়
পাওয়া না গেলে রান্না হবে না। বলতে ভুলে গেছি, বিশেষ ধরনের চাল আজ
প্রথম রান্না হবে। চালের নাম বাঁশফুল। চালটা দেখতে মোটা। রান্না হলে
চিকন হয়ে যায়। বাঁশ গাছের ফুল ফুটলে যেমন গন্ধ ছড়ায় সে রকম গন্ধ
আসে।

পল্টু স্যারের বিষাঙ্গ গাছপালার পাঠ শেষ হয়েছে। এখন তিনি
পড়ছেন— মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা বই তবকত-ই-নাসিরি। মূল ফরাসি
থেকে অনুবাদ। এ ধরনের বইপত্র তিনি কোথেকে যোগাড় করেন তাও এক
রহস্য।

আমার হাতে কোনো কাজ নাই। আমি বারান্দায় বসে বিমাঞ্চি। বিমুনি
হল নিদ্রার আগের অবস্থা। এই অবস্থায় কনশাস এবং সাব-কনশাস দুটিই
কিছু পরিমাণে জাগ্রত থাকে বলে অস্তুত অস্তুত ব্যাপার ঘটে। রাশিয়ান
বৈজ্ঞানিক মেডেলিফ পেরিওডিক টেবিল চোখের সামনে দেখতে
পেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক কেকুলে বেনজিনের গঠন দেখতে পেয়েছিলেন।
আমি তেমন কিছু দেখতে পাই না, তবে রান্নাঘরে বাদল এবং রানু কি

বলাবলি করছে তা শুনতে পারছি। প্রতিটি বাক্যের আলাদা অর্থও বুঝতে পারছি। যেমন বাদল বলল, ‘চামচের ষাটার্ট ঠিক না। আরো লম্বা চামচ হওয়া উচিত। তাহলে আর তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ত না।’ (গৃঢ় অর্থ— তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ছে। আমার খারাপ লাগছে।)

রানু বলল, ‘রান্না করতে গেলে একটু-আধটু তেলের ছিটা খেতে হয়। আপনি এত কাছে থাকবেন না, আপনার গায়ে লাগবে। (গৃঢ় অর্থ— ওগো, গরম তেল আমার গায়ে লাগে লাগুক, তোমার গায়ে যেন না লাগে।)

বাদল বলল, কড়াইয়ের সবটা তেল যদি আমার গায়ে পড়ে তাহলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকব। (গৃঢ় অর্থ— তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।)

রানু বলল, ‘হাত ধরে থাকলে আমি নাড়ানাড়ি করব কিভাবে ?’ আপনিতো ভাল পাগল! (গৃঢ় অর্থ— প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা, সেদিন চৈত্র মাস। তোমার চেখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ!)

মঞ্চ নাটকে কি হয় ? অতি আবেগঘন মুহূর্তে ভিলেনের প্রবেশ ঘটে। নাটকের ভাষায় ক্লাইমেক্স তৈরি হয়।

ক্লাইমেক্স তৈরি হয়ে গেল। ভিলেন হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করলেন বাদলের বাবা, আমার শ্রদ্ধেয় খালু সাহেব। আমি আদবের সঙ্গে তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে বসালাম। ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপা গলায় বললাম, ‘যা বলবেন, ফিসফিস করে বলবেন। এই বাড়িতে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া পাগল বাস করেন। তিনি এখন বই পড়ছেন। তাঁর পাঠে বিষ্ণু হলে কি করে বসবেন ঠিক নেই। উকি দিলেই পাগল দেখতে পাবেন।’

খালু সাহেব উকি দিয়ে পাগল দেখে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছে না-কি ?

আমি বললাম, ‘হঁ। একটু পরেই মুরগির মতো কক কক করবে ?’

‘কেন ?’

‘উনি কক কক ধর্মী মানুষ।’

‘তার মানে কি ?’

‘মানে এখনো পুরোপুরি বের হয় নি।’

‘বাদল এই পাগলের সাথে বাস করছে ?’

‘হঁ।’

‘এখন সে কোথায় ?’

আমি বললাম, ‘রান্নাঘরে।’

‘রান্নাঘরে আর কে আছে ? চন্দ্রিমা উদ্যানের মেয়েটা আছে ?’
‘হ্যাঁ !’

‘বাদলকে ডেকে আন । তাকে বলবে যে আমি আমার লাইসেন্স করা পিস্টল সঙ্গে করে এনেছি । খুনাখুনি ঘটে যাবে ।’

‘পিস্টল সত্যি এনেছেন ?’
‘হ্যাঁ ।’

‘গুলি সাবধানে করবেন । আপনার হাতের টিপ কেমন জানি না । গুলি করলেন বাদলকে, লাগল আমার গায়ে । বিনা দোষে বেহেশতে গিয়ে বসে রইলাম । সত্ত্বরটা পরী কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করল । এ বলে আমার দিকে তাকাও, ও বলে আমার দিকে তাকাও ।’

‘কথা বাড়াবে না । বাদলকে ডেকে আন ।’

আমি বাদলের সন্ধানে রান্নাঘরে ঢুকলাম । বাদলকে ঘটনা খুলে বললাম । রানু বলল, ‘কি সর্বনাশ ! উনি সত্যি পিস্টল নিয়ে চলে এসেছেন ?’

‘হ্যাঁ । এসেছেন এবং তাঁর হাতের টিপ খুবই খারাপ । বাদল একা যে বিপদে আছে তা না । আমরা সবাই বিপদে ।’

বাদল বলল, ‘আমি কি করব সেটা বল । ফায়ার স্কেপ দিয়ে পালিয়ে যাব ?’

‘না । তুই এক কাজ কর । খালু সাহেবের রাগটা আরো বাড়িয়ে দে । মানুষ অধিক শোকে পাথর হয় । অধিক রাগে হয় কংক্রিট । এমন ব্যবস্থা কর যেন তিনি রেগে কংক্রিট হয়ে যান ।’

‘কিভাবে রাগাব ?’

তুই খালু সাহেবকে গিয়ে বল, ‘বাবা, আমি ঐ মেয়েটাকে আজ ভোরবেলায় বিয়ে করে ফেলেছি । কোটে বিয়ে হয়েছে । এক লাখ এক টাকা কাবিন ।’

‘মিথ্যা কথা বলব ?’

‘হ্যাঁ, যুদ্ধে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে ।’

বাদল বলল, ‘এই মিথ্যাতেই হবে ?’

‘হওয়ারতো কথা । রাগের একটা লিমিট আছে । লিমিট ক্রস করে যাবার পর শূন্যতা ।’

বাদল রানুর দিকে তাকাল ।

রানু বলল, ‘উনি যা বলতে বলছেন তাই বল ।’

এরা যে দু’জনই তুমি লেভেলে নেমে এসেছে তা আগেই শুনেছি । তুমি যে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তা জানলাম । রানুর চোখে-মুখে নববিবাহিতা স্ত্রী সুলভ লজ্জা এবং আনন্দ ।

বাদল বলল, 'ভয় লাগছে, হিমুদা !'

রানু বলল, 'ভয়ের কি আছে ? আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

বাদল বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে লাভটা কি হবে ?'

রানু বলল, 'তুমি সাহস পাবে।'

'আমি সাহস পাব কেন ? তুমি কি সাহসের দোকান খুলেছ ?'

রানু বলল, 'ঝগড়া করছ কেন ?'

বাদল বলল, 'ঝগড়াতো তুমি করছ।'

আমি চূপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়ায় নাক গলানো যায়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় না। এরা বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মত ঝগড়া করছে। কাজেই নাক গলানো ঠিক হবে না। ঝগড়া-টগরা করে তারা একটা সিঙ্কান্তে আসুক, তারপর দেখা যাবে। আমি খালু সাহেবের কাছে চলে এলাম।

খালু সাহেব, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মৃত্তির মতো চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে বসে আছেন। তাঁকে দেখাচ্ছেও মৃত্তির মতো। নাক, মুখ শক্ত। চোখের দৃষ্টি স্থির। জর্জ ওয়াশিংটনের মৃত্তির সঙ্গে তাঁর সামান্য অমিল আছে। কারণ তাঁর হাতে খোলা পিস্তল।

পল্টু স্যার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে ভীত মনে হচ্ছে। তাঁর হাতে এখন অন্য বই— একশ এক ইলিশ রান্না। তবকত-ই-নাসিরি সম্বত পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। তিনি ঘণ্টায় একশ দশ কিলোমিটার টাইপ পাঠক। এই মুহূর্তে পল্টু স্যারের কক কক ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কক কক করছেন। যতবারই করছেন ততবারই খালু সাহেব খানিকটা কেঁপে উঠছেন।

পল্টু স্যার বললেন, 'আপনি পিস্তল হাতে বসে আছেন কেন জানতে পারি ?'

খালু সাহেব বললেন, 'আমার ছেলে এক্ষুণি রান্নাঘর থেকে বের হবে, তাকে গুলি করব।'

'কেন ?'

'সে একটা অতি সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে বিয়ে করে বসে আছে, এই জন্যে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমাদের সবার চরিত্রইতো সন্দেহজনক। শুধুমাত্র পও পাখি মাছ এদের চরিত্র সন্দেহজনক না। এরা কি করবে, কি করবে না তা আমরা জানি। হোমোসেপিয়ানদের ব্যাপারে এই কথাটা বলা যাচ্ছে না।'

খালু সাহেব বললেন, 'আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমি কাউকে বিরুদ্ধ করছি না। আপনি বিরুদ্ধ করছেন। আমার পাঠে বিষ্ণু ঘটাচ্ছেন। শান্তিমতো বই পড়তে দিচ্ছেন না। কক কক কক।’

‘কক কক করছেন কেন?’

‘আপনি বক বক করছেন, এই জন্যে আমি কক কক করছি। আমাকে শান্তিমত বই পড়তে দিন।’

খালু সাহেব বললেন, ‘কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনাখুনি পর্ব শেষ হবে— আপনি শান্তিমতো বই পড়তে পারবেন।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘গুলির শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। খুব ছোটবেলায় নানাজানের সঙ্গে পাখি শিকারে গিয়েছিলাম। গুলির শব্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কক কক কক।’

খালু সাহেব বললেন, ‘আপনি কানে হাত দিয়ে রাখুন।’

বাধ্য ছেলের মতো পল্টু স্যার কানে হাত চেপে রাখলেন। বাম কান বাঁ হাতে চেপে ধরা। ডান কান ইলিশ মাছের বই দিয়ে চেপে ধরা। আমাদের সবার দৃষ্টি রান্নাঘরের দরজার দিকে। রসমঝও প্রস্তুত। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রস্তুত। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ফিল্মের কোনো দৃশ্য হলে এখানে ক্ষক ক্ষক টাইপ মিউজিক দেয়া হতো। ক্ষক ক্ষক হচ্ছে হাটের শব্দ।

রান্নাঘর থেকে কেউ বের হল না। বসার ঘরের দরজা দিয়ে এক গাদা পুলিশ চুকে পড়ল। তারা আমাকে ছেফতার করতে এসেছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। আমি CID পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে চুকেছি।

সাধারণ নিয়মে এক ঢিলে দুই পাখি পাওয়া যায়। এখানে পুলিশ এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি পেয়ে গেল। একজন অন্তর্ধারী পেল। খালু সাহেব। বাদলকে পেল, রানুকে পেল।

পল্টু স্যারকে তারা কিছু বলল না। পল্টু স্যার নির্বিকার ভঙ্গিতে ইলিশ মাছের বই পড়া শুরু করলেন। এত কিছু যে ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই, তিনি পড়ছেন— “ইলিশ আনারস।”

ফলের মধ্যে শুধু আনারস দিয়ে ইলিশ রান্না হয় কেন বুঝলাম না। অন্য ফলগুলো কি দোষ করল?

আম ইলিশ।

কালোজাম ইলিশ।

সাগর কলা ইলিশ।

বিদেশী ফল দিয়েও রান্নার চেষ্টা করা যেতে পারে যেমন আপেল ইলিশ, আঙুর ইলিশ। ইলিশ রান্নাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

পুলিশের গাড়িতে উঠার সময় দেখলাম সাতার সাহেবকে। প্রেফতার নাটক দেখার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তাঁর হাতে পাইপ। চোখে সানগ্লাস। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় ডাকলাম, ‘সাতার ভাই!’

তিনি চমকালেন। আমার দিকে তাকালেন কি-না তা সানগ্লাস চোখে থাকার কারণে বুঝা গেল না। আমি বললাম, ‘কক কক কক।’

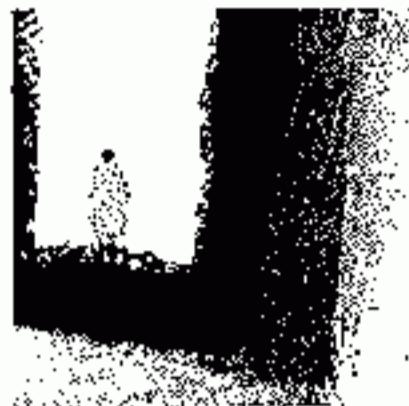
সাতার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, ‘তুই এসব কি বলছিস ?’

আমি বললাম, ‘কক কক বলছি।’

আমাকে অনুকরণ করা বাদলের দীর্ঘ দিনের স্বতাব। সেও বলল, ‘কক কক কক।’

এই মুহূর্তে বাদলের অতি ঘনিষ্ঠজন রানু। সে বাদলের অনুকরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। সে মিষ্টি গলায় বলল, ‘কক কক কক।’

আমরা কক কক করতে করতে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম।



পারিবারিকভাবেই আমরা থানা-হাজত দখল করে আছি। রানুও আমাদের সঙ্গে আছে। মেয়ে হাজতীদের জন্যে আলাদা হাজত আছে। জানা গেছে সেখানে এক হাজতী না-কি হেগে-মুতে সর্বনাশ করে রেখেছে। মেঘের আনতে লোক গেছে। মেঘের সব পরিষ্কার করবে তখন রানুকে সেখানে ট্রান্সফার করা হবে।

আমাদের হাজতে বাইরের লোক বলতে চার ফুট হাইটের একজন আছে। প্রচণ্ড গরমেও তার গায়ে চাদর। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি। সে একটু পরপর থুথু ফেলছে এবং সেই থুথু তর্জনি দিয়ে মেঘেতে ঘসছে। খালু সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, ‘লোকটা এমন করছে কেন?’

আমি বললাম, সে থু থু দিয়ে মেঘে পরিষ্কার করছে।

‘কেন?’

‘পানি পাবে কোথায় যে পানি দিয়ে মেঘে পরিষ্কার করবে? থুথুই ভরসা।’

‘পাগল নাতো?’

‘সভাবনা আছে। আবার হেরোইনচি হতে পারে।’

‘হেরোইনচি কি?’

‘এরা হেরোইন খায়। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব?’

‘আরে না। হিমু! আজ যে আমাকে এমন একটা কারেষ্টারের সঙ্গে হাজতে বসে থাকতে হচ্ছে তার মূলে আছ তুমি।’

আমি বললাম, ‘কথাটা ঠিক না খালু সাহেব! আপনি অন্ত হাতে ধরা পড়েছেন।’

খালু সাহেব বললেন, ‘এটা আমার লাইসেন্স করা পিস্তল। অন্ত হাতে ধরা পড়েছি বলছ কেন?’

আমি বললাম, ‘শুনের উদ্দেশ্যে আপনি অন্ত হাতে বসেছিলেন। এটেমট টু মার্ডার। এখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই।’

রানু বলল, ‘অবশ্যই তুমিকা আছে। আপনার কারণেই বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনি না থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাদল থাকতো তার জায়গায় আমি থাকতাম আমার জায়গায়। উনিও পিণ্ডল হাতে আসতেন না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেন না।’

খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, ‘মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, তুমি কি বল ?’

আমি ইঁয়া সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, ‘চেহারাও সুন্দর। বুদ্ধি এবং রূপ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বাদলটার দিকে তাকিয়ে দেখ— রূপ আছে। বুদ্ধি এক ছটাকও নেই। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত ?’

‘একমত।’

‘তুমিতো অনেকবার হাজতে থেকেছে। হাজত থেকে বের হবার বুদ্ধি কি ?’

আমি বললাম, ‘গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে টেলিফোন করতে হবে, এরা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গীয়-স্বজনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করুন।’

রানু বলল, ‘এই কাজ কখনো করা যাবে না। কাউকে জানানো যাবে না। পুলিশ আমাদের ধরে হাজতে রেখেছে এটা জানলে বিরাট সমস্যা হবে।’

খালু সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ‘মেয়েটাকে যতটুকু বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম, এ তারচেয়েও বুদ্ধিমতী। আই এ্যাম ইমপ্রেসড। মেয়েটার উপর থেকে রাগ দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। কি করি বলতো! ’

‘রাগ ধরে রাখতে চান ?’

‘ইঁয়া।’

‘মেয়েটা কি কথা বলছে তা শনবেন না। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। আপনি থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকুন।’

খালু সাহেব থুথুওয়ালার দিকে তাকাতেই থুথুওয়ালা বলল, ‘স্যার, স্নামালিকুম।’

খালু সাহেব ভীত গলায় বললেন, ‘ওয়ালাইকুম সালাম।’

থুথুওয়ালা বলল, ‘পুড়িং খাইবেন ?’

খালু সাহেব বললেন, ‘পুড়িং খাব মানে কি ? কিসের পুড়িং ?’

‘রক্তের পুড়িং।’

থুথুওয়ালা বসে বসে খালু সাহেবের দিকে এগুচ্ছে। খালু সাহেব আতংকে অঙ্গুর। থুথুওয়ালা বলল, ‘এক গামলা টাটকা গরম রক্ত নিবেন।

তার মধ্যে লবণ দিবেন, বাটা লাল মরিচ দিয়া ঘুটবেন। অতঃপর ঠাণ্ডা জায়গায় রাখবেন। জমাট বাইকা পুড়িং হয়ে যাবে। চাইলের আটার রুটি দিয়া খাইবেন। বিরাট স্বাদ।'

রানু থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'যেখানে ছিলে সেখানে যাও। আজেবাজে কথা বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না। আমরা ভয় খাওয়ার লোক না। আর একটা শব্দ করেছ কি থাবড়ায়ে তোমার দাঁত ফেলে দিব। জন্মের মতো রক্ষের পুড়িং খাওয়া গুছায়ে দেব। বদমাস কোথাকার।'

থুথুওয়ালা ভয় খেয়েছে। সে তার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'বাদল গাধাটা যে এমন অসাধারণ একটা মেয়েকে পছন্দ করেছে, শুধুমাত্র এই কারণে এ জীবনে সে যত অপরাধ করেছে সব ক্ষমা করে দিলাম।'

আমি বললাম, 'পছন্দে লাভ হবে না। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। এ রকম মেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।'

খালু সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'বাদলের উপর ভরসা করা যায় না। কোনো একটা গাধামি করবে। মেয়ে বলবে সব অফ।'

আমি বললাম, 'মেয়েটার 'অফ' বলার সম্ভাবনা আছে।'

খালু সাহেব গলা আরো নামিয়ে বললেন, 'মেয়েটা যদি একবার টের পেয়ে যায় বাদল কত বড় গাধা তাহলে সে কি আর তাকে বিয়ে করবে? না-কি করা উচিত?'

'করা উচিত না।'

'এখন আমাদের কি করা উচিত সেটা বল।'

'এই দু'জনের বিয়ের ব্যবস্থা করা। বাই হুক অব বাই কুক।'

'এর মানে কি?'

'এর মানে যে কোনো মূল্যে বিবাহ। প্রয়োজনে হাজতেই কর্ম সমাধান করতে হবে। ওসি সাহেব হবেন সাক্ষী। আর আপনি এখন থেকেই বৌমা ডাকা শুরু করে দিন। কাজ এগিয়ে থাকুক।'

থুথুওয়ালা আবার খালু সাহেবের দিকে এগিছে। খালু সাহেবের রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বৌমা তুমি আমার পাশে এসে বসতো!' রানুর মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। আর তখনি হাজতের দরজা খুলল। খালু সাহেব, রানু এবং বাদল ছাড়া পেয়ে গেল। আটকা পড়লাম আমি। থুথুওয়ালা খিকখিক করে হাসছে। সে এত মজা পাচ্ছে কেন কে জানে?

ধানমন্ডি থানার OC সাহেবের সামনে আমি বসে আছি। এই OC সাহেব নতুন এসেছেন। তাঁকে আমি আগে দেখিনি। ভদ্রলোককে মোটেই

পুলিশ অফিসারের মতো লাগছে না। রোগা এবং অতিরিক্ত ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পুলিশের পোশাক নেই। গোলাপি রঙের হাফসার্ট পরেছেন। প্যান্ট কি পরেছেন দেখতে পারছি না। গোপালি রঙের সার্টের কারণে তাঁর চেহারায় বালক বালক ভাব এসেছে। গোলাপি না-কি মেয়েদের রঙ। কথা সত্যি হতে পারে।

ওসি সাহেবের সামনে একটা হাফ প্লেটে পান সাজানো। তিনি পান মুখে দিলেন। আয়েশ করে কিছুক্ষণ পান চিবানোর পর ঘন ঘন হেঁচকি তুলতে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্বিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘সিগারেট ছাড়ার জন্যে পান ধরেছি কিন্তু জর্দাটা সহ্য হচ্ছে না। আগে দুই প্যাকেট সিগারেট খেতাম। চল্লিশ টিক।’

আমি খানিকটা বিশ্বিত হচ্ছি। ওসি সাহেবকে মনে হচ্ছে কৈফিয়ত দিচ্ছেন। অন্ত মামলায় গ্রেফতার হওয়া আসামীকে কোনো পুলিশ অফিসার কৈফিয়ত দেয় না।

‘আপনার নামতো হিমু ?’

‘জু স্যার।’

‘হিমালয় থেকে হিমু ?’

‘জু স্যার।’

‘রূপা নামের কাউকে চেনেন ?’

‘জু স্যার।’

ওসি সাহেব আরেকটা পান মুখে দিলেন। যথারীতি নতুন করে হেঁচকি শুরু হল। তিনি হেঁচকি দিতে দিতে টেলিফোনের বোতাম টিপছেন। একেকবার হেঁচকি দিচ্ছেন, একেকবার বোতাম টিপছেন। ব্যাপারটা যথেষ্টই ইন্টারেষ্টিং। ওসি সাহেবের টেলিফোনের বোতাম টেপা শেষ হল। তিনি টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘কথা বলুন।’

আমি বললাম, ‘কার সঙ্গে কথা বলব ?’

ওসি সাহেব বললেন, ‘হ্যালো বললেই বুঝতে পারবেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। বলুন হ্যালো।’

‘হ্যালো।’

ওপাশ থেকে রূপার গলা শোনা গেল। রূপা বলল, ‘কেমন আছ ?’

‘ভাল।’

‘কতদিন পর তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে জান ?’

‘তিনি বছর ?’

‘না। দুই বছর চার মাস। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে ধরতে। ধরতে পারি নি। শেষে বাধ্য হয়ে ঢাকার সব কটা থানায় বলে রেখেছি— হিমু নামের একজন পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে থানায় আসবে। তখন যেন আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়। এবার কি কারণে এ্যারেন্ট হয়েছ?’

‘পুলিশের CID পরিচয় দিয়ে ধরা খেয়েছি।’

‘এখন তোমাকে পুলিশ সাজতে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ। একে কি বলে জান? একে বলে একই অঙ্গে কত রূপ।’

‘পিজি হেঁয়ালি না। স্বাভাবিকভাবে কথা বল। সাধারণ একটা কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে।’

‘ঠিক আছে, সাধারণ কথা বলছি। রান্নার একটা রেসিপি বলি? রক্তের পুড়িং কি করে রান্না করতে হয় জান? প্রথমে এক গামলা গরম রক্ত নেবে। তারপর...’

‘হিমু! কেন এ রকম করছ?’

‘সরি।’

‘তোমার জন্যে বড় একটা সারপ্রাইজ আছে।’

‘বল শুনি।’

‘টেলিফোনে বলব না। তুমি আমার সামনে বসবে, তারপর বলব। সারপ্রাইজ পাবার পর তোমার মুখের কি অবস্থা হয় দেখব। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর সরাসরি আমার কাছে আসবে। ঠিক আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘হ্যাঁ না। বল— আমি আসব।’

‘আমি আসব।’

‘গুড বয়। এখন বল আমি আজ যে শাড়িটা পরে আছি তার রঙ কি?’

‘গোলাপি।’

‘আশ্চর্যতো। গোলাপি আমার পছন্দের রঙ না। আজই কি মনে করে যেন পরেছি। কিভাবে বললে?’

‘ওসি সাহেবে গোলাপি রঙের সার্ট পরেছেন, সেই থেকে মনে হল তুমিও গোলাপি রঙ পরেছ।’

রূপা বিরক্ত গলায় বলল, ‘ওসি সাহেবের সার্টের সঙ্গে আমার শাড়ির রঙের কি সম্পর্ক?’

আমি জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ওসি সাহেবের হেঁচকি থেমেছে। তিনি পানের প্লেটের দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হয় আরেকটা পান মুখে দেবেন।

‘হিমু সাহেব!’

‘জু স্যার।’

‘আপনিতো বিখ্যাত মানুষ।’

‘জানি না স্যার।’

‘আমাকে স্যার বলার প্রয়োজন নেই। আমি সামান্য পুলিশ অফিসার, আপনার মত কেউ না। এই থানার আগের ওসি সাহেবকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় তিনি বলেছেন, আপনার থানায় হিমু নামের কাউকে যদি ঘ্রেফতার করে আনা হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব যত্ন করবেন। ওসি সাহেবের নাম কামরুল। চিনেছেন?’

‘জু না।’

‘পুলিশের আইজি সাহেব একদিন থানা ইন্সপেকশনে এসেছিলেন। তিনিও হঠাতে করে বললেন, হিমু নামের কেউ কথনো এ্যারেস্ট হলে তাঁকে যেন জানানো হয়।’

‘জানিয়েছেন?’

‘না। স্যার এখন কুয়ালালামপুরে। ইন্টারপোলের এক মিটিং-এ গেছেন। চা খাবেন?’

‘খাব।’

ওসি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘চা আমার খুব পছন্দের পানীয় ছিল। সারা দিনে বিশ কাপ চা খেতাম। প্রতি কাপ চায়ের সঙ্গে একটা করে সিগারেট। বিশটা সিগারেট দিনে আর বিশটা রাতে। ইন টেটাল ফর্টি স্টিকস। আলাউদ্দিন এড ফর্টি রবারস। এখন হিমু সাহেব বলুন, আপনাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? ‘জানি না’ এই বাক্যটা বলবেন না। অবশ্যই জানেন। চা খেতে খেতে বলুন।’

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, ‘অনেকের ধারণা আমার কিছু আদিভৌতিক ক্ষমতা আছে।’

‘আদিভৌতিক মানে কি সুপার ন্যাচারাল?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার কি সত্যি আছে তেমন কোনো ক্ষমতা?’

‘জানি না।’

‘সত্যি জানেন না?’

‘না।’

ওসি সাহেব আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, ‘আপনি, আপনার আদিভৌতিক ক্ষমতা দিয়ে আমার বিষয়ে কি কিছু বলতে পারবেন ?’

আমি বললাম, ‘আজ আপনার বিবাহ বার্ষিকী। এই উপলক্ষ্মেই আপনার স্ত্রী আপনাকে গোলাপি হাফসার্ট উপহার দিয়েছেন। বিবাহ বার্ষিকীর দিন থেকে সিগারেট ছেড়ে দিবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজই আপনার সিগারেট ছাড়ার প্রথম দিন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আবার সিগারেট ধরবেন।’

ওসি সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, ‘আপনি যা বলেছেন তা ঠিক তবে যে কোনো বুদ্ধিমান লোক অবজারবেশন থেকে কথাগুলো বলতে পারে। আপনিই বলুন পারে না ?’

‘পারে।’

‘আচ্ছা আমার স্ত্রীর নাম কি বলতে পারবেন ? আমার স্ত্রীর নাম যদি বলতে পারেন তাহলে বুঝব আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।’

‘আপনার স্ত্রীর নাম আমি বলতে পারব না তবে আপনার স্ত্রীর নামের মধ্যে ধাতব শব্দ আছে। সুরেলা ধাতব আওয়াজ। আপনার স্ত্রীর নাম কি ?’

‘নৃপুর !’

ওসি সাহেব অস্বাভাবিক গভীর হয়ে গেলেন। পকেটে হাত চুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট ধরালেন। লম্বা টান দিয়ে নিজেই হতভব হয়ে গেলেন। এখন তিনি একবার সিগারেটের দিকে তাকাচ্ছেন, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বিশ্বিত মানুষ দেখতে ভাল লাগে। ওসি সাহেবকে দেখতে ভাল লাগছে। অদ্বিতীয় হাতের সিগারেট ফেলে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু ফেলতে পারছেন না।

রাত নয়টায় সব ঝামেলা চুকিয়ে আমি থানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাইরে ঝুঁম ঝুঁষ্টি। রাত্তায় এক হাঁটু পানি। ওসি সাহেব বললেন, ‘পুলিশের গাড়ি দিচ্ছি আপনি যেখানে যেতে চান, নামিয়ে দেব। আমি সঙ্গে যাব। বলুন কোথায় যাবেন ? আমার বাসায় যাবেন ? রাতে আমাদের সঙ্গে থাবেন। কিছু বন্ধু-বাঙ্কিকে আসতে বলেছি। বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্মে নৃপুর নিজে রাঁধবে। ওর ঘান্নার হাত ভাল। যাবেন ?’

‘যাব। পথে দুটা জায়গায় যেতে হবে। এক মিনিট করে লাগবে।’

‘কোনো সমস্যা নেই। জিপে উঠুন।’

পুলিশের গাড়ি প্রথম থামল সান্তার সাহেবের হোমিও ফার্মেসীতে। সান্তার সাহেব ফার্মেসী বন্ধ করছিলেন। পুলিশের গাড়ি দেখে চমকে উঠলেন। গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে আরো চমকালেন।

আমি বললাম, ‘সান্তার সাহেব, আমি যে পুলিশের লোক এটা আশা করি এখন বুঝতে পারছেন। পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘুরছি।’

সান্তার সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। আমি বললাম, ‘পুলিশকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। পুলিশ যখন বলেছে আমি CID-র কেউ না। তখনই আপনার বুকা উচিত ছিল। যাই হোক এখন আপনি প্রফেসর কেরামত আলির বাসার ঠিকানা দিন। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপার আছে।’

‘উনার বাসার ঠিকানা আমি জানব কিভাবে?’

আমি চাপা গলায় বললাম, ‘কেরামত আলি সাহেবের সঙ্গে আপনার ডিল হয়েছে উনার বাসায়। অবশ্যই আপনি বাসা চেনেন। ঠিকানা দিন। পুলিশি থাবড়া খাবার আগেই দিয়ে দিন।’

সান্তার সাহেব ঠিকানা দিলেন।

আমি বললাম, ‘আমার দিক থেকে ফিফটি ফিফটি ডিল কিন্তু এখনো আছে।’ বলেই চোখ টিপলাম। সান্তার সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না। তাঁর মধ্যে জবুথবু ভাব। ব্রেইন মনে হয় আবারো হ্যাঙ্গ করার প্রস্তুতি নিছে।

প্রফেসর কেরামত আলি থাকেন ধানমন্ডিতে। রোড ৩/এ, আমার ধারণা সান্তার সাহেব আগেই টেলিফোনে আমার কথা বলে রেখেছেন। কারণ প্রফেসর সাহেব আতংকে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হলেন। বিড়বিড় করে বললেন, ‘আমাকে কি জন্মে প্রয়োজন?’

আমি বললাম, ‘আপনার সঙ্গে একটা সিগারেট খাব এই জন্মে এসেছি।’

‘সিগারেট খাবেন?’

‘হ্যাঁ। আপনি সিগারেট খানতো?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে ধরান।’

প্রফেসর সাহেবের হাতের সিগারেট কাঁপছে। তিনি যে প্রচও ভয় পেয়েছেন তা বুকা যাচ্ছে। তিনি সিগারেট টানছেন, তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি কিছুই না বলায় তার টেনশান আরো বাঢ়ছে। আমি সিগারেট শেষ করে বললাম, ‘প্রফেসর সাহেব যাই?’

প্রফেসর কেরামত আলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিশ্চিত এই ভদ্রলোক আজ সারারাত এক ফোটাও ঘুমাতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পর পর টেলিফোন করবেন সাতার সাহেবকে। সাতার সাহেবও ঘুমাতে পারবেন না।

ওসি সাহেবের বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ফাঁকা বাসা। অনেকক্ষণ কলিং বেল বাজাবার পর ওসি সাহেবের স্ত্রী নৃপুর এসে দরজা খুলল। পরীর মতো চেহারার বাচ্চা একটা মেয়ে। সে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ‘সজল ভাই, আপনি কোথেকে? আমিতো ভেবেছিলাম এই জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘তুমি উনাকে চেন?’

নৃপুর বলল, ‘না, চিনি না। এমি এমি সজল ভাই ডাকছি। তুমি উনাকে নিয়ে এসেছ, এই জন্যে তোমার আগামী এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করলাম।’

নৃপুরের চোখ ছলছল করছে। সে যে কেঁদে ফেলার আয়োজন করছে তা পরিষ্কার। এই মেয়ের সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। সে সজল ভাই সজল ভাই কেন ডাকছে কে জানে?

ওসি সাহেব বললেন, ‘লোকজন কেউ আসে নি?’

নৃপুর বলল, ‘না। আমি সবাইকে টেলিফোন করে আসতে নিষেধ করেছি। আজকের দিনটা শুধু আমাদের দু’জনের, বাইরের লোক কেন থাকবে? তবে সজল ভাই অবশ্যই থাকবেন।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘উনি কি বাইরের কেউ না?’

নৃপুর বলল, ‘না।’

খাবারের আয়োজন ভাল না। খিচুড়ি এবং ডিম ভুনা। আজকের বিশেষ দিনের জন্যে উপযুক্ত খাবার নিশ্চয়ই না। ডিমও রান্না করা হয়েছে দু’টা। স্বামী-স্ত্রী দু’জনের জন্যে ব্যবস্থা। ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘খাবার কি এই?’

নৃপুর বলল, ‘হ্যাঁ এই। শোন তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি সজল ভাইকে নিয়ে পরে খাব। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘খাবারটা গরম কর। দুপুরের কিছু থাকলে ফ্রিজ থেকে বের কর। ডিম ভাজ। দু’টা ডিম আমরা তিনজন কিভাবে খাব? অদ্বলোককে আমি প্রায় জোর করে এনেছি।’

নৃপুর অনাফ্রেহের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে গেল। ওসি সাহেব আমাকে বললেন, ‘ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী পুরোপুরি সুস্থ কোনো মানুষ না। তার ভয়াবহ এপিলেন্সি আছে। একেকবার এপিলেন্সির এটাক হয় আর সে অস্তুত কোনো গল্প তৈরি করে। সব গল্পেই একজনের সঙ্গে তার

প্রণয় থাকে। যার সঙ্গে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মফস্বল কোনো শহরের কাজি অফিসে বিয়ে করে। বিয়ের পর পর সেই ছেলে স্ত্রী রেখে পালিয়ে যায়। সজল সে রকমই কেউ হবে। এপিলেন্সি রোগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন ?'

আমি বললাম, 'জানি। এপিলেন্সিকে বলা হয় ধর্ম প্রচারকদের রোগ। অনেক ধর্ম প্রচারক এই রোগে ভূগতেন। আমার বাবারও এই রোগ ছিল।'

'তিনি কি ধর্ম প্রচারক ?'

'হ্যাঁ তাঁর ধর্মের নাম মহাপুরুষ ধর্ম। এ বিষয়ে আপনাকে আরেকদিন বলব।'

শেষ পর্যন্ত তিনজনই খেতে বসেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, টেবিলে অনেক খাবার। পোলাও আছে, মুরগির রোস্ট আছে, খাসির মাংসের রেজালা আছে। শুরুতে শুধু দুটা ডিম কেন দেয়া হয়েছিল কে জানে।

নৃপুর বলল, 'সজল ভাই, আপনার সব কথা কিন্তু আমি আমার হাজবেডকে বলে দেব। জানি আপনি রাগ করবেন। করলে করবেন।'

ওসি সাহেব বললেন, 'কথাটা না বললেই হয়। একজন এ্যামবারাসড হবে এমন কথা বলার দরকার কি ?'

নৃপুর বলল, 'এ্যামবারাসড হলে হবে। আমাকে উনি কি অবস্থায় ফেলেছিলেন সেটা জান ? বিয়ে করবেন এই কথা বলে তিনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করলেন। আমি তখন বাচ্চা একটা মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ি। আমাকে নিয়ে গেলেন কুমিল্লায়, সেখানে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আমাকে তুলবেন। কুমিল্লায় গিয়ে পৌছলাম। সজল ভাই বন্ধুর বাড়ি আর খুঁজে পান না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তোমাদের তাহলে বিয়ে হয় নি ?'

বিয়ে কেন হবে না ? কুমিল্লায় নেমে প্রথম আমরা ঠাকুরপাড়ায় এক কাজী অফিসে বিয়ে করলাম, তারপর বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে বের হলাম।'

'ওসি সাহেব বললেন, 'বাড়ি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ?'

নৃপুর বলল, 'এত কথা তোমাকে বলব না। পরে এসব নিয়ে আমাকে খোঁটা দেবে। সজল ভাই, যেমন চুপচাপ থাচ্ছেন, তুমিও তাই কর। নিঃশব্দে খাও। সজল ভাই আমার রান্না কেমন ?'

'অসাধারণ। রান্নার ক্যাপিটিশন হলে সিদ্ধিকা কবীর ফেল করবে।'

'সজল ভাই কি যে ঠাট্টা করেন! আমিতো উনার বই দেখেই রাঁধি।'

'যে রান্নার বই লেখে সে রাঁধতে পারে না।'

নৃপুর বলল, ‘সজল ভাই! কুমিল্লার এক হোটেলে আমরা কি জন্মন্য খাবার খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে? আপনি যে ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এটা কিসের মাংস? কুকুরের না বানরের। হিঃ হিঃ হিঃ।’

হাসতে হাসতে ঘেঁষেটা গড়িয়ে পড়ছে। ওসি সাহেব দুঃখিত চোখে স্তুর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারেটা বাজল। ওসি সাহেব গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসার দরজা তালাবন্ধ। দারোয়ান বলল, ‘স্যার সন্ধ্যাবেলা রিকশা করে কোথায় যেন গেছেন। সঙ্গে চার-পাঁচটা বই ছিল। দারোয়ান নিজেই রিকশা ডেকে দিয়েছে।’

পল্টু স্যার দারোয়ানের কাছে চাবি এবং চিঠি রেখে গেছেন। আমি বাসায় ফিরলে আমাকে যেন চিঠি এবং চাবি দেয়া হয়।

চিঠিতে লেখা—

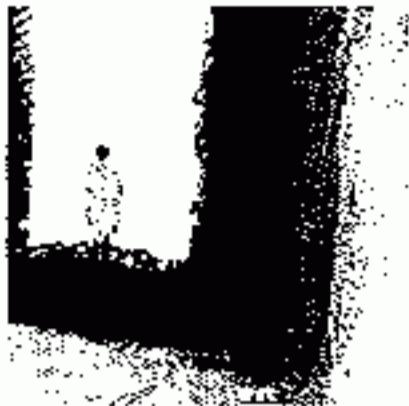
হিমু,

অংকের একটা বই পড়তে পড়তে লকারের ক্ষিনেশন নাম্বারটা মনে পড়ল। আমি ফিবোনাচি সিরিয়েল ব্যবহার করেছি। ফিবোনাচি সিরিয়েল হচ্ছে এর যে কোন সংখ্যার আগের দুটি সংখ্যার যোগফল। লকারের নাম্বারটা এই ভাবেই পেয়ে যাবে।

নানান কারণে গৃহত্যাগ করলাম। ডাক্তাররা খোচাখুচি করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে, এটা আমার ভাল লাগছে না। অন্যের কিডনী নিয়ে বাঁচার প্রশ্নই উঠে না।

আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না। যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে হারিয়ে যেতে দিতে হয়।

ইতি
তোমার স্যার।



ফিরোনাচ্ছি সিরিয়েলের প্রথম সাতটি সংখ্যা

১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১

আমি চাঞ্চিলাম সবার সামনে লকার খুলতে। তা সম্ভব হল না। সাতার সাহেব হাজতে। পুলিশের ধারণা তিনিই পল্টু স্যারকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, কিংবা গুম খুন করেছেন।

বাদল রানুকে পাওয়া গেল না। তারা হানিমুনে কাঠমুগু গিয়েছে। তারা যেদিন গেছে তার একদিন পর খালু সাহেবও চলে গেছেন। বৌমাকে না দেখে তাঁর না-কি অস্থির লাগছিল।

লকার খোলার সময় মাজেদা খালা ছিলেন। ওসি সাহেবে ছিলেন।

লকারে সীল গালা করা দলিল পাওয়া গেল। দলিল পড়ে জানা গেল তিনি তাঁর সব কিছু দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

দলিল পড়ে ওসি সাহেবের চোখ ছলছল করতে লাগল। তিনি বললেন, ‘পুলিশদের সমস্যা কি জানেন? তারা সব সময় খারাপ লোকদের দেখে চোর, ডাকাত, খুনি, ধর্ষক...। তাল মানুষদের সঙ্গে তাদের দেখা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ যখন দেখা হয় তারা আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ে।’

মাজেদা খালা বললেন, ইস এতগুলো টাকা খামাখা নষ্ট। ওসি সাহেব কঠিন চোখে মাজেদা খালার দিকে তাকানোয় তিনি ঝিম মেরে গেলেন।

আমি আগের জীবনে ফিরে গেছি। পথে হাঁটা। আগে বেশির ভাগ সময় রাতে হাঁটতাম, এখন হাঁটি দিনে। যদি হঠাৎ পল্টু স্যারের দেখা পাওয়া যায়।

সেই সম্ভাবনা অবশ্য ক্ষীণ। উনি মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। এ ধরনের মানুষরা ডুব দিয়ে আড়ালে চলে যেতে চাইলে তাদের খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না।

একদিন দেখা হয়ে গেল কিসলুর সঙ্গে। সে জিপের প্যান্টের সঙ্গে তিনি সাইজ বড় একটা মেরুন রঙের শার্ট পরে হাঁটছে। আমাকে হঠাৎ দেখে

থমকে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগের পজিশন। যে কোনো মুহূর্তে
অলিম্পিক দৌড় দেবে। আমি বললাম, কি অবস্থা?

‘জু। ভাল অবস্থা?’

‘পিস্টলের গুলি পাওয়া গেছে?’

‘জু না।’

‘গুলি ছাড়া পিস্টলতো ছুরি কাঁচির চেয়ে নিম্নস্তরের অন্ত। কোনো একটা
মজা পুরুর দেখে ফেলে দাও।’

‘জু আচ্ছা।’

‘চল একজনের কাছে নিয়ে যাই। সে নতুন ধারার রান্নার রেসিপি জানে।’

‘রান্নার রেসিপি দিয়ে আমি কি করব?’

‘একটা বিদ্যা শিখা থাকল। কোন বিদ্যা কখন কাজে লাগে কিছুইতো
বলা যায় না।’

‘একটা জরুরি কাজ ছিল।’

‘তোমার যে কাজ, দুপুর তার জন্যে উপযুক্ত সময় না। চল যাই ঘুরে
আসি।’

কিসলু বিরস মুখে বলল, ‘চলুন।’

তাকে নিয়ে গেলাম হাজতে দেখা হওয়া থুথুওয়ালার কাছে। সে থাকে
কলাবাগানের সামনের নার্সারিতে। মালির কাজ করে। কিসলুকে দেখে সে
বলল, রঙের পুড়িং কিভাবে রান্নতে হয় জানেন ভাইজান? এক গামলা
টাটকা রক্ত নিবেন। পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ দিবেন...

কিসলু বিড় বিড় করে বলল, ‘একি পাগল?’

আমি বললাম, ‘নাহ।’

‘রঙের পুড়িং বানাতে চায় সে পাগল না?’

‘তুমি গুলি করে রক্ত বের কর তোমাকে কেউ পাগল বলে না। আর এই
বেচারা রক্তকে দিয়ে একটা খাদ্য বানানোর কথা বলছে তাকে পাগল
বলছ। কথাটা কি ঠিক?’

কিসলু চুপ করে রইল। থুথুওয়ালা বলল, ‘হিমু ভাই, আপনার জন্যে
একটা গাছের চারা আলাদা করে রেখেছি একদিন এসে নিয়ে যাবেন।’

‘গাছের নাম কি?’

‘দুপুর মণি। ঠিক দুপুরে ফুটে। টকটকা লাল রঙের ফুল। বিরাট
সৌন্দর্য।’

কিসলু আমার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাচ্ছে। সাহস করে বলতে পারছে
না। আমি বললাম, তোমার বন্ধুর খবর কি? সোহাগ! সে আছে কেমন?’

‘জানি না।’

‘জান না কেন? বন্ধু, বন্ধুর খোঁজ রাখবে না! তোমার মত লোকজনদের একা চলাফেরা করাও তো বিপজ্জনক।’

‘বিদায় দেন যাই। জরুরি কাজ ছিল।’

‘তোমাকে যখন পেয়েছি, এত সহজে ছাড়ছি না। চল দুই ভাই মিলে একটা ছিনতাই করি।’

‘কি বললেন?’

‘গুলি হোক বা না হোক, তোমার সঙ্গেতো একটা পিস্তল আছেই? ব্রীফকেস হাতে এমন কাউকে আটকাও। ব্রীফকেস রিলিজ করে আমার কাছে দাও। আমি ঘোড়ে দৌড় দিব।’

কিসলু এই পর্যায়ে নিজেই ঘোড়ে দৌড় দিল। ভূমড়ি থেয়ে পড়ল এক পত্রিকা হকারের উপর। হকার গলা উচিয়ে বলল, ধর ধর।

চাকা শহরে কেউ একজন ধর ধর বলা মানে মহা বিপদ। চারদিক থেকে ধর ধর শুরু হয়ে গেল। কিসলু প্রাণ পথে ছুটছে। তার পেছনে পেছনে অনেকেই ছুটছে। এদের সঙ্গে জুটেছে একজন পুলিশ সার্জেন্ট। মনে হয় বেচারার আজকের আমদানি ভাল হয় নি। পুলিশ সার্জেন্টের আমদানি ভাল না হলে তারা আহত বাঘের মত হয়ে যায়। তখন তারা অসীম সাহসে ছিনতাইকারী ধরে।

কিসলুর পরিণতি দেখার জন্যেই আমাকে ছুটে যেতে হল। সে সার্জেন্টের হাতেই ধরা থেয়েছে। গণধোলাই শুরুর আগের অবস্থায় আমি উপস্থিত হয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলাম। পল্টু স্যারের ড্রাইভারের কারণে চোখ টিপ্টা আমি বেশ ভাল রঞ্জ করেছি। পুলিশ সার্জেন্ট আমার চোখ টিপে উৎসাহিত। ধরেই নিয়েছেন আমদানী ভাল হবে। ব্যাংকে এলসি খোলা হয়ে গেছে। তিনি কঠিন গলায় বললেন, ভীড় করবেন না। যে যার কাজে চলে যান। একে আমি থানায় নিয়ে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

জগ্রত জনতা নিতে গেল। তবে তারা এত সহজে অকুলস্থল ছেড়ে যাবার মানসিকতা নেই। আমি উচু গলায় বললাম, এ আমার আপন ভাইগু। হেরোইন খায়। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছে। এক সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছি— হঠাৎ মানিব্যাগ তুলে নিয়ে দৌড়। একে থানায় দিয়ে কোনো লাভ আছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে। আমি বরং একে কানে ধরে তার মাঝে কাছে নিয়ে যাই। আপনারা চলে যাবেন না। আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসুন।

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি বললাম, ‘পুলিশের সঙ্গে আমার কথা নাই। ইচ্ছা করলে আপনিও মোটর সাইকেল নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসুন।’

ঢাকা শহরে অনেক দিন পর একটা মজার দৃশ্যের অবতারণা হল। আমি কিসলুর কানে ধরে এগুচ্ছি। আমার পেছনে জাত্রত জনতা। সবার শেষে মোটর সাইকেলে পুলিশ সার্জেন্ট। জনতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আমি কিসলুর কানে কানে বললাম, তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। এ ছাড়া গতি নাই। বাসা কোথায়?

‘কাওরান বাজার।’

‘মা বাসায় আছেন তো?’

‘হ।’

ঢাকা শহরে যারা ঘোরাঘুরি করে তাদের বেশির ভাগেরই কোনো কাজ নেই। সবাই জুটে যাচ্ছে। মিছিলে মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকল। আমার ধারণা আজকের এই ঘটনার পর কিসলুর ঝুপান্তর হবে। ভালোর দিকে না-কি আরো মন্দের দিকে তা বলা অবশ্য বেশ কঠিন। অসম্ভব ভালো এবং অসম্ভব মন্দের বিভাজন রেখা অতি সূক্ষ্ম।

মাঝে মাঝে আমি খালু সাহেবের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে উত্তেজিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাদল বিষয়ে উত্তেজনা।

‘বাদলের কাণ শুনেছ?’

‘নতুন কিছু করেছে?’

‘নতুন কিছু না। সেই পুরানো গীত। বৌমার সঙ্গে ঝগড়া। বৌমা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।’

‘আপনি বললেই তো খাওয়া শুরু করবে।’

‘আমি কেন বলব? প্রতিবার আমাকে কেন ঝামেলা মিটাতে হবে?’

‘আপনার কথা রানু ফেলতে পারবে না বলেই যা করার আপনাকে করতে হবে।’

‘আমি যখন বেঁচে থাকব না, তখন কি হবে?’

‘তখন একটা বিরাট সমস্যা হবে।’

‘বৌমার জন্যে আমি টেনশানে অস্তির হয়ে থাকি। এত ডিপেনডেন্ট আমার উপর। সেদিন শাড়ি কিনবে রঙ পছন্দ করতে পারছে না। দোকান থেকে টেলিফোন করেছে। বাধ্য হয়ে অফিস বাদ দিয়ে গেলাম।’

‘কি রঙ পছন্দ করলেন ?’

‘দুইটা শাড়ি ছিল, একটা হালকা সবুজ আর একটা কফি কালার। আমি কফি কালারটা পছন্দ করলাম।’

‘আপনার দিনতো খালু সাহেব ভালই যাচ্ছে।’

খালু সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার মত ভান করে বললেন, ‘এটাকে তুমি ভাল বলছ ? বিশাল যন্ত্রণায় আছি। ঐ দিন তোমার খালার সঙ্গে রাগ করে বললাম, ভাত খাব না। বৌ মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবা খাবে না। কাজেই আমিও খাব না। তোমার খালা গেল আরো রেগে। বিরাট ক্যাচাল শুরু হয়ে গেল।’

খালু সাহেবের সঙ্গে যতবারই কথা হয় আনন্দ পাই। একটা মানুষ জগতের আনন্দ যজ্ঞের নিম্নরূপে উপস্থিত হয়েছে, এটা অনেক বড় ব্যাপার। আনন্দ যজ্ঞে আমাদের সবার নিম্নরূপ। কিন্তু আমরা নিম্নরূপের কার্ড হারিয়ে ফেলি বলে যেতে পারি না। দূর থেকে অন্যের আনন্দ যজ্ঞ দেখি।

একদিন হাজতে সান্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অন্ন কিছুদিন হাজত বাসের কারণেই ভদ্রলোক বুড়িয়ে গেছেন। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। আমাকে দেখে হাহাকার করে উঠলেন।

‘বাবা, আমাকে এই নরক থেকে বের করতে পারবে ?’

‘পল্টু স্যারকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এরা আপনাকে ছাড়বে না।’

‘ওদেরকে বল, আমি খুঁজে বের করব। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার অনেক সিটেম আছে। ঝাড়-ফুঁক আছে। জীন দিয়ে তদবিরের ব্যবস্থা আছে। যারা এসব করে তাদেরকে আমি চিনি।’

‘দেখি কিছু করতে পারি কি-না।’

‘তুমি অবশ্যই করতে পারবে। তোমার কথা এরা শুনবে এখানে এক হারামজাদার সঙ্গে আমাকে রেখেছে, সে রোজ রাতে আমার গায়ে পেশাব করে। তাকিয়ে দেখ কালো গেঞ্জি গায়ের বদমাইশটা।’

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালার দিকে তাকালাম। সে দাঁত বের করে বলল, ‘গত রাতে পেশাব করি নাই, স্যার। উনারে জিজেস করে দেখেন। যদি মিথ্যা বলি, আমি মানুষের জাত না।’

সান্তার সাহেব ধরা গলায় বললেন, কার সাথে আমাকে রেখেছে দেখেছ ? এরচে মরণ ভাল না ?

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, কথা সত্য স্যার।

সান্তার সাহেব বললেন, এমিতেই সারা বাত ঘুম হয় না। হঠাৎ যদি কোনো কারণে চোখ লাগে এই বদমাইশটা পা দিয়ে খৌচা দেয়।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, গফ সফ করার জন্যে আপনেরে জাগাই।

‘তোর সঙ্গে কি গল্প করব ?’

‘আমি দুইটা মার্ডার করছি এই গপ শুনবেন ?’

‘না— চুপ থাক ।’

শুনেন না। মজা পাইবেন। রাইতে হাতে ইট নিয়া ঘূরতাছি শোয়ার জায়গা পাই না। ভাল জায়গা পাইলে মাথার নিচে ইট দিয়া ঘূম দিব। হঠাৎ দেখি সাত অট বছরের এক পুলা ঘুমাইতাছে। সুন্দর চেহারা। ইট নিয়া আগাইলাম। মাথাত বাড়ি দিয়া মাথা খেতলায়া দিব এই আমার চিন্তা।...।

সান্তার সাহেব বললেন, আর বলবি না। চুপ চুপ।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, চুপ চুপ কইরা লাভ নাই তোরে পুরা গল্প শুনতে হবে।

সান্তার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, হিমু এর হাত থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার কর। তোমাকে আমি কথা দিলাম আমি মঙ্গা শরীকে যাব। সেখানে তওবা করে শুন্দ হব।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, স্যার আমারে সাথে নিবেন ? আমি তওবা করব না। আমি দেখব। আমি তওবা বিশ্বাস করি না। পাপ করলে শান্তি। তওবা আবার কি ? আমি শান্তির জন্যে তৈয়ার। একবার একজনের বিচি ফালায়া খাসি বানায়া দিছিলাম। আমি একা না। আমরা ছিলাম তিন জন। দুই জন চাইপ্যা ধরছে। আমি অপারেশন করছি।

সান্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বলছে শুনছ ? এই রকম একজনের সঙ্গে বাস করছি।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, সুযোগ পাইলে আপনের উপরে একটা অপারেশনের ইচ্ছা আছে। একলা পারব না। আরো দুই তিন জন হাজতে চুকলে তারারে দলে টাইন্যা একটা চেষ্টা নিব। স্যার ছেপ খাবেন ?

সান্তার সাহেব হতভুর গলায় বললেন, ছেপ খাব মানে!

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, হা করেন। মুখে ছেপ দেই। খায়া দেখেন মজা পাবেন। দুষ্ট লোকের ছেপ খাইতে মজা। সাধু লোকের ছেপে মজা নাই। স্যার হা করেন।

আমি সান্তার সাহেবকে এই অবস্থায় রেখে চলে এলাম। তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এর জন্যে তাকে নরকে যেতে হয় নি। পৃথিবীতেই তাঁর জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাপারগুলো কি কাকতালীয়ভাবে ঘটে ? না কেউ একজন ব্যবস্থা করে দেন ? এই বিষয়ে বিশ্যাত একটা কবিতাও আছে—

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষেতে সুরাসুর ।

আমি কালো পেঞ্জিওয়ালাকে দেখেছি— সে উত্তর মেরু হলে দক্ষিণ মেরুর
একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। রোগা
গাত্র বর্ণ ধৰ্বধবে সাদা। হলুদ রঙের একটা শার্ট পরেছেন। শার্ট ছাপিয়ে তাঁর
গায়ের রঙ ছিটকে বের হচ্ছে। তিনি বড় একটা এলুমিনিয়ামের হাড়ি হাতে
ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয় আয় বলে কাকে যেন ডাকছেন। আমি এগিয়ে
গেলাম। ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম, কাকে ডাকছেন ?

তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, কাকদের ডাকছি। ওদের জন্যে খিচুরি
রান্না করে এনেছি।

‘একটু বুঝিয়ে বলবেন ?’

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, কাকরা সারাজীবন আবর্জনা খায়। ভাল
কিছু খেতে পারে না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমি ওদের খিচুড়ি রান্না করে
খাওয়াই।

‘কতদিন পর পর খাওয়ান !’

‘মাসে দু’বারের বেশি পারি না। আমি গরিব মানুষ !’

ভদ্রলোক পাতিলের ঢাকনা খুলে দিয়েছেন। কাকরা এসে খিচুড়ি খাচ্ছে।
তিনি আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে বের হচ্ছে। আমি
দ্রুত দূরে সরে গেলাম কারণ আমার বাবা বলে গেছেন—

“তোমার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তুমি
কিছু মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষের
সাক্ষাত পাইবে। অতি অবশ্যই তুমি
তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হাত
দূরে থাকিবে। কারণ মহাপুরুষদের
আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। একবার
তাহাদের আকর্ষণী ক্ষমতার ভিতর
পড়িলে আর বাহির হইতে
পারিবে না। তাহাদের বলয়ের
ভিতর থাকিয়া তোমাকে চক্রবার
ঘূরিতে হইবে। ইহা আমার
কাম্য নয়।”

এক দুপুরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা। তিনি প্লাস ভর্তি করে আবের রস খাচ্ছে। তাঁতে তাঁর চোখে খুশি খুশি ভাব এসে গেছে।

‘এই হিমু! এদিকে আয় আবের রস খাবি?’

‘খাব।’

‘একে প্লাস ভর্তি করে দাও। বরফ কুচি বেশি দেবে।’

আমি প্লাসে চুমুক দিচ্ছি। বরফের কুচি মুখে চুকে চিড়বিড় ভাব হচ্ছে। ভাল লাগছে।

‘পল্টু ভাইজানের শোবার ঘর থেকে ছবিটা আমি নিয়ে এসেছি। ছবিটা আমি আমার শোবার ঘরে টানিয়েছি।’

‘ছবিটার কোনো নাম দিয়েছ?’

‘নাম দেব কেন?’

‘এত সুন্দর একটা ছবি নাম ছাড়া মানায় না। মোনালিসার সঙ্গে মিল দিয়ে ছবির নাম দাও ‘মাজেলিসা।’ মাজেদা থেকে মাজেলিসা।’

‘চুপ করে আবের সরবত খা। উন্ট উন্ট কথা।’

‘তুমি রোজ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাক।’

‘তা থাকি। এতে মনটা খারাপ হয়। কি ছিলাম আর কি হয়েছি। আগে মনটাও ছিল সরল। এখন কুটিল হয়ে গেছে।’

‘উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল খালা। মধ্য দুপুরেই শুধু মানুষের ছায়া পড়ে না। মানুষ হয় ছায়াশূন্য।’

‘এর মানে কি?’

‘কোনো মানে নেই এমি বললাম।’

‘উল্টাপাল্টা কথা আমাকে বলিস নাতো! বুঝতে পারি না। মাথা এলোমেলো লাগে। আরেক প্লাস সরবত খাবি?’

‘খাব।’

খালা আরো দু’প্লাসের অর্ডার দিলেন।

‘পল্টু ভাইজানের কোনো খৌজ পেয়েছিস?’

‘না। মহাপুরূষ পর্যায়ের মানুষেতো! নিজেরা ধরা না দিলে ধরা যায় না।’

‘পত্রিকায় ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দে।’

‘কি দরকার?’

‘একটা মানুষ এমি এমি হারিয়ে যাবে?’

‘মানুষের জন্মাই হয়েছে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।’

‘ফিলসফির কথা আমাকে বলবি না। থাপড় খাবি।’

আমি চুপ করে গেলাম। আখের রসে মন দিলাম। আজকের রস অন্যদিনের চেয়ে ভাল হয়েছে। অন্ততের কাছাকাছি। রস থেকে পুদিনা পাতার গন্ধ আসছে। যদিও কোনো পাতা দেখা যাচ্ছে না। দার্শনিকভাবে বলা যায়—“সে নেই তার গন্ধ রেখে গেছে।”

এক রাতে ওসি সাহেব তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে কৈ মাছ এসেছে। নানান পদের কৈ মাছ হবে। কৈ উৎসব।

বাসায় পৌছে দেখি জটিল অবস্থা। ওসি সাহেবের কাজের মেয়ে চুরি করে পালিয়েছে। গয়না টাকা-পয়সা নিয়েছে। কত টাকা, কি কি গয়না এখনো বের হয় নি। কারণ ওসি সাহেবের স্ত্রীর নৃপুরের এপিলেপ্টিক এটাক হয়েছে। সে আধমরার মতো শুয়ে আছে।

ওসি সাহেব বললেন, ‘কাজের মেয়েটা টাকা গয়না নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি, যে হাড়িতে করে কৈ মাছ পাঠিয়েছে সেটাও নিয়ে গেছে। নৃপুর বলল, মেয়েটা যখন চুরি করছিল তখন আমার এটাক শুরু হয়েছে। আমি চোখের সামনে ছায়া ছায়া ভাবে দেখছি সে চাবি দিয়ে আলমিরা খুলছে। টাকা বের করছে। অথচ আমার কিছুই করার নেই।’

আমি বললাম, ‘তুমি কি একটু উঠে বসতে পারবে? আমার একটা ঘুম ঘুম খেলা আছে। এই খেলাটা খেলতাম। খেলাটা ঠিকমতো খেলতে পারলে এপলেকটিক অসুখটা ভাল হয়ে যাবার কথা।’

ওসি সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, ‘প্রীজ! প্রীজ।’

আমি বললাম, ‘নৃপুর আমি তোমাকে যা চিন্তা করতে বলব, তাই চিন্তা করবে। চোখ বন্ধ কর।’

নৃপুর চোখ বন্ধ করল।

‘এখন তুমি আছ একটা গভীর বনে। চারদিকে বিশাল সব বৃক্ষ। আলো ছায়া? খেলা। তুমি আপন মনে ঘুরছ। তোমার চারপাশে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে। বাড়িটা অনেক উঁচুতে। সেখানে উঠার কাঠের সিঁড়ি আছে।

সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠছ। কারণ তুমি জান কাঠের বাড়িতে তোমার জন্যে এক আনন্দময় বিশ্বয় অপেক্ষা করছে। তুমি একের পর এক সিঁড়ি ভাঙছ। যতই উপরে উঠছ ততই তোমার শীত শীত লাগছে এবং ঘুম পাচ্ছে। অনেক কষ্টে তুমি ঘুম আটকে রেখেছ। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আর আনন্দময় বিশ্বয়কর দৃশ্যটা দেখতে পাবে না।

এখন তুমি কাঠের ঘরের দরজার সামনে। দরজায় হাত রাখা মাত্র দরজা খুলে যাবে। দরজায় তুমি হাত রেখেছ। দরজা খুলে যাচ্ছে। নূপুর, তুমি কি দেখছ?

‘দেবশিশুর মতো একটা ফ্রক পরা বাক্ষা মেয়ে বসে আছে। সে মনে হয় রাগ করেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে রেখেছে।’

‘মেয়েটা কার নূপুর?’

‘মনে হয় আমার।’

‘হাত বাড়াও। হাত বাড়ালেই মেয়েটা ঝাঁপ দিয়ে তোমার কোলে এসে পড়বে। হাত বাড়াও। এখন মেয়েটা কোথায়?’

‘আমার কোলে।’

‘দেখ ঘরে একটা খাট আছে। খাটে বিছানা করা। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে খাটে উঠে পড়। এখন দু’জনই ঘুমাও। তোমার খুব শান্তির ঘুম হবে। এই ঘুম যখন ভাঙবে তখন তোমার মাথার অসুখটা সেরে যাবে। আর কখনো মাথায় ঝড় উঠবে না।’

নূপুর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ওসি সাহেব দৌড়ে গেলেন। স্বীকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ওসি সাহেবের চোখ ভর্তি বিস্ময়। তিনি আমার হাত ধরে কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, ‘নূপুর কি সত্যি ভাল হয়ে যাবে?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ। এতো বিশ্বাস কোথেকে পেলাম কে জানে। আমি বললাম, আপনাদের পরীর মতো রূপবতী একটা মেয়ে হবে। অবিকল রূপার মতো। তাকে নিয়ে আপনাদের হবে সোনার সংসার।’

‘রূপা কে?’

‘আছে একজন। সে আমার জন্যে অঙ্গুত সারপ্রাইজ নিয়ে অপেক্ষা করে। আমি কখনো তা দেখি না।’

‘কেন দেখেন না?’

‘দেখলেইতো সারপ্রাইজ নষ্ট। ভাই, আমি বিদায় নিচ্ছি।’

এখন মধ্যদুপুর।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমার হাতে দুপুরমণি গাছের চারা। অপেক্ষা করছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের যখন আমার ছায়া পড়বে না এবং দুপুরমণি গাছে ফুল ফুটবে। অস্পষ্টভাবে মনে হল বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল। তিনি ধরা গলায় বললেন, ‘হিমু! বাবা শোন, আমার দীর্ঘদিনের সাধনা নষ্ট হয় নি। তোকে দেখে বড়ই আনন্দ হচ্ছে।’

‘বাবা আমি কি মহাপুরূষ হয়ে গেছি ?’

‘বলা কঠিন !’

‘কঠিন কেন ?’

‘সব মানুষের মধ্যেই একজন মহাপুরূষ বাস করেন। তাঁরা কখনো
প্রকাশিত হন। কখনো হন না। সমস্যা এইখানেই। তুই তোর মা’র ছবিটা
দেখেছিস ?’

‘না।’

‘দেখবি না ?’

আমি জবাব দিলাম না। আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য মাথার উপর
উঠে গেছে এখন কথা বলার সময় না।

নৈশের সময়।



বাংলাদেশের লেখালেখির ভূবনে প্রবাদ পুরুষ।
গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তৃঙ্গম্পর্ণী জনপ্রিয়তা।
এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের
অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাতে করেই
চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। আগুনের পরশমণি,
শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল
ছায়া, আমার আছে জল... ছবি বানানো
চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক
বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ
অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও
তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন
NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের
ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in
Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্টি চরিত্র হিমু এবং
মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়।
তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি
নন্দনকানন 'গুহাশ পল্লী'তে।



Himur Madhyadupur by Humayun Ahmed



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com